শুরু হল। শিলিগুড়ি সিরিজ
ধারাবাহিক কাহিনি। তাজ্জব মহাভারত
ধারাবাহিক থ্রিলার।
মরা মৌমাছির চোখ
বড় গল্প। শিখা শাশ্বতিকী
শ্রীমতী ডুয়ার্স।
স্বাস্থ্য সেবায় পুং-নারী বৈষম্য

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

অগাস্ট ২০১৯। ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্ত্বা

৫ বছর পেরিয়ে

উত্তরে নদী যখন ভীষণ ভাবিয়ে তোলে

উত্তরবাংলার ঘনঘোর বর্ষায় প্রকৃতিপ্রেমীর চোখে হিমালয় থেকে নেমে আসা নদী যখন বড় রোমান্টিক, নদী পাড়ের দরিদ্র চাষার কাছে তা অতি ভয়াবহ, ধ্বস বা ভাঙনের আতংকে কিংবা বন্যার আশংকায় বিনিদ্র রাতের পর রাত। উত্তরের ইকোসিস্টেম বড় ভঙ্গুর, বড় অবিশ্বাসী। নদী তাই আজও এখানে হাজার চাষা জেলে মাঝির চোখের জল হয়েই বয়ে যায়। ভাঙনে দূষণে আমাদের নদী আজ বিপন্ন।

মাথা যখন শূন্য

উত্তর বঙ্গদেশ এখন আগাম চলে আসা ঘোর বরষা উপভোগ করে করে ক্লান্ত। উত্তরের ভেজা ভেজা মানুষগুলির স্পর্শে এখন শীতল সজীবতা মেলে। দক্ষিণের ভাপা পিঠের মত মানুষগুলি উত্তরবঙ্গ বা তিস্তা তোর্সা কিংবা কাঞ্চনে আসছে, মুঠো মুঠো মৌসুমি মেঘ ব্যাগে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে দেশে। কেন জানি ও দেশে তেমন বৃষ্টি নেই! বৃষ্টি না আসা, নাকি বৃষ্টিতে প্লাবিত হওয়া? কোনটা অভিশাপ আর কোনটা আশির্বাদ? বলা মুস্কিল, তবে কলকেতার মানুষগুলি বড় কষ্টে আছে, কংক্রিটের জঙ্গলে তাপ যে বড় বেশি।

উত্তরের নির্মীয়মান মহাসড়ক ফোর লেন এখন মহাবিপর্যস্ত পরিবহণ পথ। বৃষ্টির তোড়ে বিঘ্নিত নির্মাণকাজ, খানিক অন্তর ডাইভারসন মানেই জ্যামের ঘনঘটা। বাসে এসময় সাড়ে তিন ঘন্টার পথ পেরোতে সাত ঘন্টাও লাগছে। নদীতে জলস্ফীতিতে বন্ধ হয়ে গেছে বহু ফেরি সার্ভিস, ছাত্র শিক্ষক ফেরিওয়ালা দোকানদার ব্যবসায়ী রুগী সবার দুর্দশা বাড়ে এসময়, বর্ষা এলেই উত্তর যেন আবার পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে যায়।

বর্ষায় পর্যটক নাকি ডুয়ার্সে রোমাঞ্চ খুঁজতে আসেন? বারান্দায় বসে বৃষ্টিতে সবুজ দেখার রোমাঞ্চ, খালি পায়ে ভেজা ঘাসে হাঁটবার রোমাঞ্চ, জোকের মাথায় নুন ঢালবার রোমাঞ্চ, জংলি লতাপাতার হঠাৎ ঘাড়ের ওপর এসে পড়বার রোমাঞ্চ, জলঢাকা মূর্তির লাফিয়ে চলার রোমাঞ্চ, ভুটানের কালো মেঘ সরিয়ে পাহাড় দেখবার রোমাঞ্চ, ঢেকি শাক ও বরলি মাছের রোমাঞ্চ।

রিসর্টের ঘরবাড়ি ঘিরে এসময় নির্জন নিষিদ্ধ বন্য আহ্বান, হাফ ভাড়াতেও মেলে। রেলপথে আকাশপথে টিকিটও এসময় সহজলভ্য, তবুও সে রোমাঞ্চের পরশ নিতে ভিড় জমে কই? তিস্তা-জলঢাকা-তোর্সা-মানসাইতে হলুদ বা লাল সঙ্কেত, প্লাবিত সড়ক, ভেসে যাওয়া রেললাইন, ভেঙ্গে পড়া সেতু, মারণ মশার রক্তচক্ষু, হড়পা বান ইত্যাদি ইত্যাদি বর্ষার ডুয়ার্স ঘিরে যুগ যুগ ধরে তৈরি হওয়া অজস্র অজানা ভয় উৎসাহী প্রকৃতিপ্রেমীদের আজও ভরসা জোগাতে পারে নি, মনসুন ইন গোয়া বা কুর্গ কিংবা মেঘালয়ের মত তাঁদেরকে বর্ষায় ডুয়ার্সমুখী করে তুলতে পারে নি। বছরের পর বছর এ ক্ষতি বয়ে এসেছি আমরা, টানা তিনটে মাস হাত গুটিয়ে বসে থাকে গোটা ডুয়ার্সের পর্যটন বাণিজ্য। অনুপ্রেরণা কিংবা উন্নয়নের ছটায় কাঠবেকার ডুয়ার্সের এ করুণ ছবি ধরা পড়ল না আজও। ডুয়ার্সের বর্ষায় জলমগ্ন চা বাগানে আজ আর ক্ষতির কূলসীমা নাই, বৃষ্টির তোড়ে চায়ের ঠেক জমে ওঠে না কিছুতেই। 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' হয়ে ঘুরে বেড়ানো লাল-নীল বাতিওয়ালা উত্তরের মন্ত্রীসান্ত্রীরা কি এসব ক্ষতির কোনও পরিসংখ্যান দিতে পারবেন আদৌ?

মিছিলে হাঁটতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে উত্তরের যুবক, রাজনীতিতে রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে আসবার আশঙ্কায়। কর্মসংস্থানই এখন একমাত্র প্রশ্নচিহ্ন হয়ে ঝুলছে টাওয়ারের মাথায় মাথায়। বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে বের করে না দেখানো অবধি বঙ্গবিজয়ের পথ অধরা থেকে যাবে, এই কঠিন সত্যকে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন নেতারা, যেমন তাঁরা উপলব্ধি করছেন ডিগবাজিতে কোনও মজা নেই আর। উত্তরের মস্তিস্ক জুড়ে আজ রানওয়ের শূন্যতা, মস্তকহীন ডুয়ার্সভূমি যেন উন্মুখ হয়ে আছে ভিনগ্রহের কোনও বিমান কিংবা সসার অবতরণের অপেক্ষায়।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা
দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৭৪৯৭২৫৭৮১

লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

তুফানগঞ্জ
আনন্দবাজার বুক স্টল ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১

দিনহাটা
হরিপদ রায় ৯৯৩২৬৩৯০৬৮

আলিপুরদুয়ার
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪

মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৭৮৬৪৯৯৫৫১৫

বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান
হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা
এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা
পরিবেশ। পরিকাঠামো। পর্যটন
জঙ্গল। জনসত্তা
শিক্ষা। স্বাস্থ্য। সাহিত্য। সংস্কৃতি

এখন ডুয়ার্স

ষষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, অগাস্ট ২০১৯

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের চিঠি ২

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
শিলিগুড়ির কথা ৬

কোচবিহারের কড়চা
অবশেষে হেরিটেজ ডিগ্রি লাভ কোচবিহারের হারানো গৌরব কি ফিরিয়ে দিতে পারবে? ৮

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন
নেতা বা পণ্ডিতের ভরসায় নয় নদী বাঁচাতে মানুষকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় ১০
নদী ঘটিত বিপর্যয় মোকাবিলায় ডুয়ার্সের পাশে ইসরো ও জিএসআই ১২

উত্তরে সেদিনের সেনাপতিরা
পীযুষকান্তি মুখার্জি সংগ্রাম ও রাজনীতির দুঃসাহসী সেনা ১৪

নদীতে মাছের অভাবে বিপন্ন বংশানুক্রমিক পেশা মাছচাষে সাবেক মৎসজীবিদের উৎসাহ বাড়ছে কি? ১৬

কবির কলমে
এইসব খড়কুটো ১৮

বইপত্রের ডুয়ার্স
তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার বই ১৯

চেনেন কি ডাঙ্গী এরোড্রাম? ২০

পর্যটন
তবু বর্ষা এলেই মনে পড়ে জয়ন্তীর কথা ২১

শ্রীমতি ডুয়ার্স
পুরাণে উপেক্ষিতা এক নারীর দেবী হয়ে ওঠা হল কি? ২২
স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য! ৩৬
আমার মেয়েবেলা ৩৭

ধারাবাহিক কাহিনি
তাজ্জব মহাভারত ২৪
মরা মৌমাছির চোখ ৩২

গল্প
শিখা-শাশ্বতিকী ২৮

পাঠকের পর্যটন
দলগাঁও থেকে পাখির চোখে বর্ষার মায়াবী ডুয়ার্স ৪০

নিয়মিত বিভাগ
ফেসবুক পোস্ট ৪
খুচরো ৫
রাসায়নিক রস ৩৮

সেরা পোস্ট

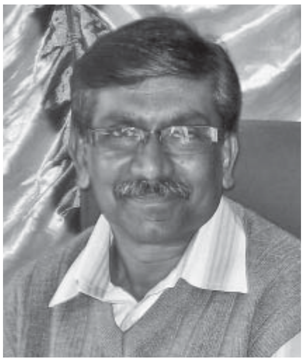

গৌতম সরকার

শিক্ষকদের অনশন বনাম অর্বাচীনের প্রগলভতা

ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার যতদূর জানি আমাদের দেশে এখনও আইনত কেড়ে নেওয়া হয়নি।

এই অধিকার গণতন্ত্রের পরিসরও বটে।

মাইনে বাড়ানোর দাবিও সেই ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের মধ্যে পড়ে।

তা সে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হোক, আর শিক্ষক, সরকারি কর্মচারিদের বেতন বাড়ানোর দাবি হোক, এই অধিকার গণতন্ত্র সম্মত।

সেই অধিকার সরকার মানতেও পারে, নাও মানতে পারে।

এই যেমন আর্থিক অসঙ্গতির অজুহাত দেখিয়ে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় অনশনরত শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি খারিজ করে দিলেন। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। অন্যত্র আলোচনা করা যেতে পারে এ নিয়ে।

কিন্তু চমকে গেলাম, এক নেতার বয়ানে।

যাঁর বক্তব্যের অর্থ, মাইনে বাড়ানোর দাবি তোলাই অপরাধ হয়েছে শিক্ষকদের।

তাঁর চমকপ্রদ যুক্তি, নিয়োগপত্রে যে বেতনের উল্লেখ ছিল, তাতে না পোষালে তখন চাকরিটা না নিলেই হতো।

অর্থাৎ, একবার চাকরি নিলে আর কখনও মাইনে বাড়ানোর কথা বলা যাবে না।

এর চেয়ে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী কথা আর কী হতে পারে?

যিনি এই কথা বলছেন, তাঁর দল আবার গণতন্ত্র রক্ষার কথা অহর্নিশি বলে থাকে।

হ্যাঁ, তিনি শাসকদলের নেতা।

জনপ্রতিনিধিও বটে।

তিনি আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুস্থানীয়।

তিনি যাঁর কাছে রাজনীতির শিক্ষা পেয়েছেন, তিনি কিন্তু আমৃত্যু মানুষের অধিকারের পক্ষেই লড়াই করেছেন।

অথচ এই নেতাটি অনশনরতদেরই শুধু নয়, গোটা শিক্ষক সমাজকে, সমস্ত শ্রমিক, চাকরিজীবীদের অসম্মান করলেন।

সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে পদদলিত করলেন।

যা বললেন, তা অর্বাচীনের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

সুজিত কুমার বর্মন

দীপ্তি রায়

বাড়ি ময়নাগুড়ি। বয়েস ৫৮। ইমা একজন খুবে জনপ্রিয় তুক্ষা গানের শিল্পী। তুক্ষা হইল তন্ত্রের গান। এই তন্ত্রের উৎপত্তি পেরায় অতি পাচিন। এই তন্ত্র সাধনা দেও দেবীর পতি গানের মাইধ্যমে করা হইসিলো এক সময়, সেইগিলায় পরবত্তিতে তুক্ষা গান হিসাবে পরিচিত হইসে।

বাপের বাড়ি রাঙালি বাজনা হবার বাদে রাজবংশী আদিবাসী নেপালি সংস্কৃতির আদপকায়দা আর গানের চর্চা ছোটো থাকি করিয়ায় বড়ো হয়া উঠে। বাড়িত গানের পরিবেশ ছিলোয়। দিদির হাত দিয়ায় গানের হাতত খড়ি। পরবত্তিকালে এই গান বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ির লোকজন মানি নেয় না। গান করির যায়া ম্যালা মানসির ম্যালা কাথা শুনির হইসে। এমনকি পাড়ার নোকগিলাও ভাল চোখত দ্যাখে নাই, এলাও। কইলকতার এডিয়োত পথম অডিশন দিবার যায়া একজন বাইনের অপচেষ্টাও অডিশনত আটক করির পারে নাই। উমা বর্তমানে আকাশবাণী এডিওর A গ্রেডের শিল্পী। ম্যালা কষ্ট আর ঝড়ঝাপ্টার মইধ্য দিয়া আজি একজন উত্তরবঙ্গের পসিদ্ধ সংগীত শিল্পী হিসেবে নিজেক চিনিয়া দিসেন। বিয়ার আগত থাকি পচুর কষ্ট করিয়া এই তুক্ষা গানের সংগ্রহ শুরু করিসেন স্বামীর হাত ধরিয়া। উমার ব্যবহার আর সাদাসিদা হাসিখুশি মনটা দেখিয়া কায় কবে যে উমা এতো বড় একজন শিল্পী।

ছবি অনিন্দিতা রায়

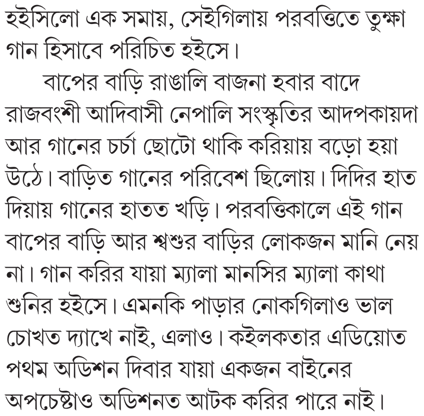

ঈশানী দত্ত রায়

হাবি আর জাবি

সুইস ফ্যামিলি রবিনসনের বাংলা অনুবাদটি বড় প্রিয়। নেপোলিয়নের রাজত্ব থেকে পালাতে গিয়ে নিউ গিনিতে যাবে রবিনসন পরিবার, আশ্রয় নিতে হল নির্জন দ্বীপে। সেখানে গাছের ডালে বাড়ি, শোওয়ার ঘর, এমনকি, বইয়ের তাকও। খুব ভাল লাগত পড়তে। সংগ্রামের চেয়েও গাছের ডালে ঘুমনো, ঘর তৈরির এক একটা পর্ব বেশ মিষ্টি লাগত। হয়তো অনুবাদের গুণে।

এই চাঁদ-মঙ্গলে যাওয়ার বাসনা, চাঁদের জমি কেনার কথায় মনে হল। অথচ মনে হওয়ার কথা ছিল রবিনসন ক্রুসো, কাস্ট অ্যাওয়ে ফিল্ম।

পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশে যাওয়াটা কিন্তু সাঙ্ঘাতিক। কী অসম্ভব একা এবং না-ফিরতে পারার ভয়। অ্যাডভেঞ্চার, অকূল সৌন্দর্য সব ছাপিয়ে অন্তত আমার মতো ভীরু মানুষের কাছে।

নির্জনতা, বহু মানুষের মাঝে অপূর্ব একা ছাপিয়ে এ অন্য অনুভূতি। চারপাশে বা বহু দূরে অনেক মানুষ আছে বলেই নির্জনবাস উপভোগ করা যায়? শব্দ আছে বলেই কি ভাল লাগে নৈঃশব্দ? আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে যাঁরা থাকেন মাসের পর মাস, বহু বহু বহু দূরে পৃথিবীর রূপ তাঁরা দেখেন, ভাবেন কোনও একদিন ফিরবেন সেখানে।

কবিতা সিংহ লিখেছিলেন, *'একা হতে চেয়েছিল*
তবু কেউ রুমাল নাড়েনি বলে দিল্লী কালকার
ট্রেন থেকে নেমে গেল পার্বতী মিত্তির
সন্ন্যাস নেবার পরও চিদানন্দস্বামী
দরজায় কলিং বেল রেখেছিল অভ্যাসশত'

ধরা যাক, মঙ্গলে বা চাঁদে মানুষ থাকতে শুরু করল। এমন তো নয় যে গাদা গাদা মানুষ সেখানে থাকবেন। হাতে গোনা কয়েকজন হয়তো বা। কেমন লাগবে তাদের? অসহায় লাগবে? ভয় করবে? পৃথিবীতে ফিরতে ইচ্ছা করবে তো? বা সেটাই যদি নতুন পৃথিবী হয়ে যায়, তা হলে? পুরনো পৃথিবীটা ততদিনে নির্জন আর একটা মঙ্গল হয়ে গিয়েছে।

প্রবাসে কয়েক জনকে দেখেছি, যাঁরা কলকাতায় বাড়ি করেছিলেন অবসরজীবনে ফিরবেন বলে। কিন্তু আর ফিরতেই পারলেন না, কেননা ততদিনে নাম ধরে ডাকার মতো, বাড়ি ফিরে দেখা করা, গল্প করার মতো লোকগুলোই নেই।

চাঁদের বাড়ি বড় সহজ নয়।
বাড়ি ফেরাও সহজ নয়।
বাড়ি সহজ নয়।

জল শহরের ক্ষেত্রসমীক্ষা

খুচরো ডুয়ার্স

অতএব ক্ষেত্র সমীক্ষা করিতে করিতে জলপাইগুড়ি ঢুকিলাম। কেন ঢুকিলাম?

প্রবল বর্ষণে কলিকা সমিতি ফাঁকা যাইতেছে। মহাতামাক টানিয়া বিঠোভেনের সিম্ফনি শুনিতে শুনিতে ঘুমাইবার তাল করিতেছিলাম, কিন্তু বিভাগীয় সম্পাদক ফোন করিয়া কহিল, 'শীঘ্র জলপাইগুড়ি টাউনে যাও। কী কী ঘটিতেছে তাহা সরেজমিনে জানিয়া আইস। পারিলে সত্যতা যাচাই করা হয় নাই এমন ভিডিও যোগার করিবে।' ইহা শুনিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা লইয়া ঢুকিলাম জলপাইগুড়ি। কিছুকাল আগে মালবাজারের কেদারা মানব গম্মেন্টের পয়সায় শিব ঠাকুর বানাইয়া অবাক করিয়াছিলেন। এইখানেও কেদারা মানব কিছু ঘটাইল নাকি?

খুব বৃষ্টি হইতেছিল। দেখিলাম শিবধনু প্যান্ট গুটাইয়া ছাতা মাথায় হাঁটিয়া যাইতেছেন। ডাকিয়া কহিলাম, 'ব্যাপার কী বলুন তো? ছুটির দিনে খামোকা দ্বিপ্রহরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন? অদ্য না বিশ্বপেয়ালায় দেশের খেলা?'

জবাবে তিনি যা কহিলেন তাহা রোমহর্ষক! মনে হয় যেন দস্যু মোহনের কাহিনি পড়িতেছি। যা শুনিলাম সংক্ষেপে কহি।

হঠাৎ কোথা হইতে কী ঘটিল কেহ জানে না— টাউনে আবার জল জমিয়া গেল। এই রকম তো ঘটিবার কথা নহে! কর্পোরেশনে তো জল জমিতেই পারে না! কর্পোরেশন গড়িবে বলিয়াই তো কংগ্রেস ছাড়িয়া গ্রাস রুটে গিয়াছিলেন তাহারা। অনুপ্রেরণার আহ্বানে ঘর ছাড়িয়া ছিলেন তাঁহারা! কর্পোরেশন হইয়াছে। ইহার পরও কেন জল?

শিবধনুবাবু তাই ছাতা মাথায় অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিয়াছেন কর্পোরেশন নাকি হয় নাই। কেন হয় নাই? কারণ, টাউনের নগরপাল নাকি রথ লইয়া খুব ব্যস্ত। খারাপ লোকেরা কহিতেছে যে তিনি ধর্মসঙ্কটে পড়িয়াছেন। তাহা কী বিষয়? শিবধনুবাবু কহিলেন, 'উহা আরেক রহস্য। চলুন ফুটপাতে দাঁড়াইয়া কথা বলি। আপনি ভাগ্যবান যে আজ ছুটির দিন এবং বর্ষা। নইলে ফুটপাত পাইতেন না। নগরপাল উহা খর্চা করিয়া বানাইয়াছেন দখল করিয়া ব্যবসা করার নিমিত্তে।'

তখন ফুটপাতে দাঁড়াইয়া তিনি নগরপালের ধর্মসঙ্কটের উপাখ্যান শুনাইলেন। তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—।

নগরপাল নগরে কাজেকর্মে ঘুরিবেন বলিয়া একখানি রথ দরকার। পাঁচ-ছয় লক্ষমুদ্রা খরচ করিয়া তাঁহার জন্য রথ একখানি কিনিলে কেহ আপত্তি করিত না। কিন্তু না কিনিয়া তিনি নাকি পঁয়ষট্টি সহস্র মুদ্রা মাসপ্রতি দিয়া একখানি রথ ভাড়া করিয়াছেন। তৈলব্যায় স্বতন্ত্র।

'বলেন কী?' আমি অবাক হইলাম। শিবধনু মুচকি হাসিয়া কহিল, 'স্বয়ং ধর্মরাজের আদেশ। না মানিয়া মরিবে নাকি?'

জানিলাম ভাড়াটে রথের মালিক নাকি স্বয়ং ধর্মরাজ। রথ স্বয়ং বিশ্বকর্মা বানাইয়াছেন। জানিয়া ভক্তি হইল। নগরপাল ভাগ্যবান বটেক! জিজ্ঞাসিলাম, 'ধর্মরাজ এখন কোথায়?'

শিবধনুবাবু বিশেষ তাম্বাকুশলা জ্বালাইয়া কহিল, 'তাহা আরেক কাহিনি। শুনিবেন?'

ভাবিলাম, না শুনিয়া উপায় কী? সম্পাদক আদেশ করিয়াছেন। ঘুম অবশ্য কাটিয়া গিয়াছিল। যেটুকু তবুও ছিল, দ্বিতীয় উপাখ্যান শুনিয়া উবিয়া গেল মাইরি! কাহিনি সংক্ষেপে এই রকম—

ধর্মরাজ একখানি পান্থশালা খুলিয়াছিলেন। তাহায় সুরাকক্ষ ছিল। উর্বশী-মেনকা-রম্ভা গান গাহিত। মৈরায় মদ্য পান করিতে করিতে সেই সঙ্গীত সুধা কানের ভিতর দিয়া মরমে লইয়া পাব্লিক মহানন্দে টাকা উড়াইত। জয়ন্তী নগরে ছিল ধর্মরাজের প্রাসাদ। তথায় উর্বশীরা থাকিতেন। এইভাবেই কাটিতেছিল দিন। হেনকালে হঠাৎ পার্থসারথীবাবু হুঙ্কার দিলেন এই বলিয়া যে তিনি বড়ফুলে যাইতেছেন। টাউনে হৈচৈ পড়িল। পার্থসারথীকে স্বয়ং মহাদিদি ডাকিলেন। দু-জনায় কী কথা হইল জানা গেল না কিন্তু নগর কোটালের চর আসিয়া ধর্মরাজের পান্থশালা চ সুরাকক্ষ হইতে সবাইকে ধরিয়া লইয়া গেল।

তখন জানা গেল, উর্বশীরা কেবল গাহিতেন না। তাঁহারা নাচিতেনও। পান্থশালার সুরাকক্ষে নৃত্য সহকারে গীতাদি নিষিদ্ধ। জনৈক মেনকা চুপি চুপি নাকি কোটালের নিকট অভিযোগ লিখিয়া কহিয়াছেন যে বলপূর্বক নৃত্য করান হইত। না মানিলে ভয় দেখাইত। কেবল নৃত্য নহে, দেহ বেচিতেও বাধ্য হইতেছে তাঁহারা।

আমি প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম, 'বিরোধীদের তো এইরূপে ফাঁসান হয়। ধর্মরাজ নিশ্চই বড়ফুল?'

শিবধনু হাসিয়া কহিলেন, 'তাই যদি হয় তবে নগরপাল তাঁহার রথ লইবে কেন?'

'তাও তো বটেক!' আমি দমিয়া গেলাম। 'তবে পান্থশালার কী হইল?'

তখন জানিলাম পান্থশালার তালায় কোটালের লোক গালা মারিয়াছে। ধর্মরাজ ভ্যানিশ। জয়ন্তীনগরের প্রাসাদ হইতে প্রচুর সুরাপূর্ণ কলস মিলিয়াছে আর মিলিয়াছে রাশি রাশি কন্ডোমম্। উহা জন্মনিরোধকের সংস্কৃতায়িত আকার। যাহা হউক! এইবার বুঝিলাম রথের ভাড়া দিবে বলিয়া ধর্মরাজকে পাইতেছেন না নগর কোটাল। ইহা এক প্রকার সঙ্কট বটেক। আমি শিবধনুকে কহিলাম, 'বেশি ভাবিবেন না। কর্পোরেশন হইলেই সব সমস্যা মিটিয়া যাইবে। কিন্তু কর্পোরেশন হইল না কেন? প্রতিশ্রুতি কি কম পড়িয়াছিল?'

অদূরে এক মাতাল এতক্ষণ আপন মনে বক্তৃতা করিতেছিল। সে কহিল, 'যেবার অচ্ছে দিন আসিবে বলিয়া ঘোষণা হইল সেবারই বলিয়াছিল কর্পোরেশন হইবে। প্রধানমন্ত্রী কথা না রাখিলে নগর কোটাল কেন রাখিবেন? নগর কোটাল বড়ফুলে যাইবেন। তখন জলপাইগুড়ি হরদ্বার হইবে!'

মাতালের কথা ধরিতে নাই। শিবধনুবাবু কোথায় জানি চলিয়া গেলেন ইত্যবসরে। সম্পাদক বলিয়া দিয়াছেন টাউনে কাহার কয়টি ওয়ার্ড তাহা জানিয়া আসিতে। আমি টোটো রিজার্ভ করিয়া ঘুরিতে লাগিলাম। হিসাব করা সহজ কর্ম। বিরোধি ওয়ার্ডে রাস্তাঘাট ভাঙিয়া চৌচির, শাসকের ওয়ার্ডে ভাল— এইসূত্র প্রয়োগ করিয়া বুঝিলাম ২৫টার মধ্যে ১০টা বিরোধিদের। জল অবশ্য শাসক-বিরোধি বুঝে নাই। কারা জানি জলনিকাশি ব্যবস্থা গড়িয়া নিশ্চিতে ছিলেন যে টাউন ভাসিবে না। কিন্তু জলের বিকাশ দেখিয়া বুঝিলাম ভুল করিয়া জলবিকাশি ব্যবস্থা করিয়াছে।

শুনিলাম আগামী বৎসর রবীন্দ্রমাসে নাকি নগরপাল নির্বাচন হইবে। এই অবস্থায় রথের মালিক না ফিরিলে নগরপাল ভাড়া দিবেন কাকে? ভাড়া না দিলে তিনি রথ চড়িবেন কেমনে? রথ না চড়িলে তিনি শত শত কোটি মূদ্রার বাজেট লিখিবেন কী ভাবে? বাজেট না লিখিলে টাকা আসিবে কী ভাবে? টাকা না আসিলে তিনি স্থানীয় বিশ্বকর্মাদের কী দিবেন? না দিলে তাঁহারা গড়িবেন কী? না গড়িলে উর্বশী-মেনকা আসিবে কেন? আসিলেও নাচিবে কেন? না নাচিলে ধর্মরাজ শিরস্ত্রাণ না পরিয়া দ্বিচক্রযান চালাইবে কী রূপে? চালাইলেও পুলিশ তাঁহাকে আগের মত ছাড়িয়া দিবে কেন?

তখন মাতাল কোথা হইতে আসিয়া কহিল, 'যদা যদা হি কন্ডোমস্য স্টকম্ ভবতি ভবঃ/ অভ্যুত্থানাম্ ডান্সং বারং তদাত্মাহম্ বড়ফুলম্/ ধর্মসংস্থায় অটোমেটিকো চ সম্ভবামি যুগে যুগে।'

আমি বলিলাম, 'মানে?'

'ব্যাটার পায়ের ফাঁক দিয়ে একটা রেখা চলে গেছে। রেখার দু-পাশে দু-রকম ফুল।'

মাতাল চলিয়া গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, জলপাইগুড়ি টাউন লইয়া কিছু না লিখাই ভাল। সদ্য সমাপ্ত ভোটে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রাম শব্দ উচ্চারিত হইয়া গিয়াছে। ওয়ার্ড মিনিং কেহ না বুঝুক, মাতাল বুঝিয়াছে।

নগর কোটাল যাইবেন, না বড়ফুলে যাইবেন, ইহাই বড় জিজ্ঞাসা। ক্ষেত্রসমীক্ষা মিথ্যা হয় না। ইহা ঋষি গৌতমের নিকট শিখিয়াছিলাম।

কলম সিং

ধারাবাহিক প্রতিবেদন

শিলিগুড়ির কথা

সৌমেন নাগ

উত্তরবাংলার স্বঘোষিত রাজধানী। দেশের গরিমা নর্থইস্ট এখন 'লুক অ্যাট দ্য নিউ গ্ল্যামার গার্ল', আর তার গেটওয়েতে হিলকুইনের বাড়ি দার্জিলিং হিলস আগলে দাঁড়িয়ে থাকা এক অস্বাভাবিক স্ফীতকায় রমণী। নাম তার শিলিগুড়ি ওরফে সিল্লিগুরি। দেড়শ বছর আগেকার জলপাইগুড়ির অধীন বৈকুণ্ঠপুর পরগনার ছোট্ট এক অখ্যাত মৌজা আজ কীভাবে উত্তরের বিশালতম নগরীতে রূপান্তরিত হল? তবু মহানগরী হয়েও হয়ে উঠতে পারছে না কেন শিলিগুড়ি? আজকের ও উত্তরকালের পাঠক জানতে চাইবে সেই ঘটনাপঞ্জীকে। আজকের শিলিগুড়ির রূপান্তরকে বুঝতে হলে জানতে হয় শিলিগুড়ির সূচনাকালের কথা। আজকের এই উত্তরণের কারণগুলি না জানা থাকলে ভবিষ্যতের শিলিগুড়ির সম্ভাব্য উপাদানগুলির ব্যবহারের ভাবনাকে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। শুরু হল ধারাবাহিক প্রতিবেদন।

প্রথম পর্ব

শিলিগুড়ি। শাল, সেগুন, ধুপি আর টুন। জঙ্গল, আগাছা। বৈকুণ্ঠপুর পরগনার ছোট্ট একটা অজানা মৌজা। লোকসংখ্যা নগণ্য। অনুমান একশরও নিচে। প্রশাসনিক সীমায় জলপাইগুড়ির অধীন।

ইংরেজ কোম্পানির অধীন ভারতের সঙ্গে চলছিল ভুটানের বিরোধ। ভুটান কোচবিহার রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মাঝে মধ্যে সেখানে লুঠতরাজ করত। ভুটান দরবারে কোচবিহার রাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে বন্দি করে রাখার মতন চূড়ান্ত কূটনৈতিক রীতি লঙ্ঘন করতেও তারা সঙ্কোচবোধ করে নি। কোচবিহার রাজ্যের অমাত্যরা ভুটানের এই আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে এবং রাজাকে উদ্ধার করতে ইংরেজ কোম্পানির সাহায্য প্রার্থনা করে। ইংরেজরা এই প্রার্থনায় ভুটান আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করে বন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য করে এবং ইংরেজদের শর্ত মেনে চুক্তি করে এর মূল্য হিসাবে কোচবিহার সাম্রাজ্য তার স্বাধীনতা হারিয়ে ইংরেজদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

ভুটানের দৌরাত্ম্য এর পরেও থামে নি। তারা মাঝেমধ্যেই ভারত-ভুটান সীমান্তে হানা দিতে থাকে। ইংরেজ কোম্পানি তখন তিব্বতের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য স্থাপনে অত্যন্ত উদগ্রীব ছিল। তারা ভুটানের বিরুদ্ধে তাই সার্বিক আক্রমণে যেতে চায়নি। কারণ ভুটানের সঙ্গে তিব্বতের শাসকদের নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় দিক থেকে ছিল নৈকট্য। তাছাড়া কোম্পানি ভুটানের মধ্যে দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক পথ বের করতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে পড়েছিল। ভুটানের বিরুদ্ধে সার্বিক সামরিক অভিযান চালালে সেই সম্ভাবনার ক্ষেত্র নষ্ট হবার আশঙ্কার কথা ভেবেছিল।

পুরনো শিলিগুড়ি শহর

১৮২৬ সালে অসম ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে এই এলাকার ভৌগলিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টে গেল। ভুটানের সঙ্গে (১৮৬২) আলোচনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে স্যার এ্যাশলে এডেনকে আলোচনার জন্য পাঠানো হলে ভুটান রাজদরবারে ব্রিটিশ দূতের মুখে ময়দার আঁঠা লেপে তার চুলের মুঠি ধরে দুটি সন্ধিপত্রে তাকে জোর করে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয়। একটিতে বলা হল ইংরেজ সরকার অসম ও বেঙ্গল ডুয়ার্সকে ভুটানের হাতে অর্পন করবে অপরটিতে ইংরেজদের কাছে ভুটান থেকে পালিয়ে যে সমস্ত ক্রীতদাস ও রাজনৈতিক অপরাধীরা আশ্রয় নিয়েছে তাদের ভুটানের কাছে অর্পণ করবে।

১৮৬৪ সালে ইংরেজ বাহিনী আক্রমণ করে। তবে তাদের পরাজিত করা সহজ হয় না। দীর্ঘ এক বছর পর ভুটান ইংরেজ সরকারের শর্তে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তিই ইতিহাসে 'সিনচুলা চুক্তি' বলে পরিচিত। এই চুক্তির মধ্যেই সেদিনের ছোট্ট মৌজা শিলিগুড়ির ভ্রূণ সৃষ্টি হয়েছিল।

সিনচুলা চুক্তির অন্যতম শর্ত হিসাবে সমগ্র বেঙ্গল ডুয়ার্স এবং তিস্তার বাম পার্শ্বস্থ পার্বত্য অঞ্চল থেকে নিম্ন পার্বত্য অঞ্চলের জলবিভাজিকা ইংরেজ সরকারের অধীনে আসে। এই চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ভুটানের দখলমুক্ত এলাকাকে নিয়ে প্রথমে দুটি জেলা হল। (১) সদর মহকুমা। তিস্তা নদীর উভয় পাড়ের পার্বত্য অঞ্চল হল এর অন্তর্ভুক্ত। আয়তন ৯৬০ বর্গ মাইল। (২)

তরাই মহকুমা। পাহাড়ের পাদদেশের সমগ্র অঞ্চল এই মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হল। আয়তন ২৭৪ বর্গ মাইল সদর কার্যালয় হল আজকের ফাঁসিদেওয়ার কাছের ছোট্ট গ্রাম হাঁসখোওয়া।

সমগ্র ডুয়ার্সকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হল। পূর্ব ডুয়ার্স, এর মধ্যে ছিল সঙ্কোশ নদীর পূর্ব পাড় থেকে আসামের হিমালয়ের পাদদেশ। একে যুক্ত করা হল আসামের সঙ্গে। অপরদিকে তিস্তা নদীর পূর্ব পাড় থেকে সঙ্কোশ নদীর পশ্চিম পাড় যুক্ত হল বাংলার সঙ্গে। সেটি পশ্চিম ডুয়ার্স।

পশ্চিম ডুয়ার্স জেলা ভাগ হল তিনটি মহকুমায় (১) তিস্তা ও তোর্ষা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। সদর মহকুমা, সদর দপ্তর ময়নাগুড়ি। তোর্ষা ও সঙ্কোশ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে বক্সা মহকুমা। সদর দপ্তর আলিপুরদুয়ার। পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে ডালিংকোট/ডামপং/কালিম্পং মহকুমা, সদর দপ্তর কালিম্পং।

১৮৬৭ সালের ১লা জানুয়ারি কালিম্পং মহকুমার সঙ্গে যুক্ত করে দার্জিলিং জেলাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। সদর মহকুমা ও তরাই মহকুমা তখনও শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর পরগনার ছোট্ট একটা মৌজা হয়ে অন্য সব মৌজার ভিড়ে ঢাকা পড়ে ছিল। আজকের একপ্রান্ত হাঁসখোওয়া তরাই মহকুমার সদর দপ্তরের গৌরবে অনেক বেশি পরিচিত ছিল। আজ হাঁসখোওয়ার বাসিন্দারা শিলিগুড়ির রাজপথে দাঁড়িয়ে তাদের সেই মহকুমার সদর দপ্তরের ইতিহাসের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কি না বলা যাবে না, তবে সে সময় শিলিগুড়ির কোনও পরিচিত অস্তিত্ব যে ছিল না সেই ইতিহাস আজকের শিলিগুড়ির ইতিহাস বুঝতে জানা দরকার।

আজকের শিলিগুড়িকে জানতে এই এলাকার আরও একটা ইতিহাসের খোঁজ রাখা দরকার। কারণ এই ইতিহাসের মধ্যে শুধু যে শিলিগুড়ির বিবর্তনের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য উপাদান আছে তা নয় সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশেষ করে অসমের জীয়নকাঠির স্পর্শ আছে। সেই ইতিহাস দুটি পাতা আর একটা কুড়ির সবুজ সোনার সাম্রাজ্যের ইতিহাস। চা। মানুষের হাতে তাদের প্রয়োজন মেটাতে বাধা না পড়লে ত্রিশ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত সে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

১৮২৩ সালে মেজর রবার্ট বুশ আসামের মাটিতে জঙ্গলের মধ্যে চা-গাছের অবস্থান দেখেই তার জহুরী চোখে বুঝতে পেরেছিলেন এই গাছ উত্তর-পূর্ব ভারতের হিমেল হাওয়া ও মাটিতে তাদের বাণিজ্যিক ভাণ্ডার ভরিয়ে দেবে। ১৮৩৫ সালে বাৎসরিক ৩০০০ টাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ২৪ মাইল লম্বা ও ৬ মাইল চওড়া যে ৭৫০০ ফুট উচ্চতার পাহাড়ি খণ্ডটি তাদের সৈনিক ও রাজপুরুষদের গ্রীষ্মকালিন নিবাস নির্মাণের ভাবনায় সিকিম রাজার কাছ থেকে অধিগ্রহণ করেছিল, এই আবিষ্কারের ফলে তার সব কিছুই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের স্পর্শের মতন পাল্টে গেল।

১৮৪১ সালে আসামে বিজয়যাত্রা ঘটিয়ে চা দার্জিলিঙে প্রথম তার শিকড় প্রোথিত করেছিল। ডা. ক্যাম্বেল তাঁর বাসভবনে কুমাং থেকে চিন দেশীয় যে চা-গাছ পুঁতেছিলেন তা এখানকার আবহাওয়ার গুণে কয়েক বছরের মধ্যে পাহাড়ে সবুজ মখমলের চাদর বিছিয়ে দিয়ে সমতলের তরাই ভূমিতে যাত্রা করল। তার চলার পথে চা-সাম্রাজ্যের দাবি মেটাতে সৃষ্টি করে চলেছিল জনপদ, সেই সঙ্গে রাজপথ। তাই ১৮৩১ সালে জেনারেল নেপেয়ারের তত্ত্বাবধানে পাহাড়ের বুক চিরে নির্মিত হল পাঙ্খাবাড়ি রোড। এই রাস্তা প্রথমে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিল বটে তবে পাহাড়ের সবুজ সাম্রাজ্যের চা-বাগিচার সাহায্যে প্রয়োজন হল আরেকটি প্রশস্ত রাস্তা। ১৮৬০ সালে শুরু হল হিলকার্ট (বর্তমানে তেনজিং নোরগে) রোড নির্মাণের যাত্রা। এর জন্য দরকার ছিল প্রচুর শ্রমিক। যারা শুধু কঠোর পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণুই হবে না তাদের লড়তে হবে একাধারে কালান্তক ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের বিরুদ্ধে অন্যদিকে হিংস্র শ্বাপদ আক্রমণ প্রতিরোধে। এগতে হবে কঠিন পাথরের বুক খোদাই করে ঘন জঙ্গলের মধ্যে পথ কেটে, স্থানীয় অধিবাসী বলতে পাহাড় তো প্রায় জনবিরল। সমতলের রাজবংশীরা এই কাজে উৎসাহী নয়। বাঙালিরা তো এসেছিল বাবু হয়ে অনেক পরে সাজানো সাম্রাজ্যের বাবু হতে। তাই আনা হল রাঁচি, বিলাসপুর, ছোটনাগপুর, ময়ূরভঞ্জ থেকে কালো কষ্টিপাথরে খোদাই করা জীবন্ত মানুষদের। আনা হল পূর্ব নেপালের দারিদ্র

আজকের শিলিগুড়িকে জানতে এই এলাকার আরও একটা ইতিহাসের খোঁজ রাখা দরকার। কারণ এই ইতিহাসের মধ্যে শুধু যে শিলিগুড়ির বিবর্তনের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য উপাদান আছে তা নয় সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশেষ করে অসমের জীয়নকাঠির স্পর্শ আছে। সেই ইতিহাস দুটি পাতা আর একটা কুড়ির সবুজ সোনার সাম্রাজ্যের ইতিহাস। চা।

পীড়িত এলাকাগুলি থেকে পাহাড়ি মানুষগুলিকে। দীর্ঘ ন' বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি করা হল রাস্তা। সব রাস্তা এসে মিলল এই সমতলে। গড়ে উঠতে শুরু করল শিলিগুড়ি।

চা-সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এবং একে কেন্দ্র করে পাহাড়ে যে জনবসতি গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে পর্যটন কেন্দ্র রূপে দার্জিলিঙে পর্যটক আসা শুরু হলে প্রয়োজন হল রেল পথের। আনা হল কলকাতার ট্রাম কোম্পানির লাইন পাতার নির্মাণ সংস্থা মিচেল এবং রামসে কোম্পানিকে। এরা কাজ শুরু করার পর এই অঞ্চলে এক রহস্যজনক দুর্ভিক্ষ শুরু হল যা এখানকার মানুষের কাছে ছিল একেবারেই অচেনা, কোম্পানির তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল 'রিলিফ অপারেশন'। রেললাইন পাতার কাজে যোগ দিলে খাবার ও রেশন পাওয়া যাবে। এই অপারেশনের অন্তরালে কোম্পানি বলতে গেলে বিনা মজুরিতেই কাজটি শেষ করেছিল। এই সবকিছুই কিন্তু শিলিগুড়িকে গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। কারণ এরা সবাই মিলিত হয়েছিল পাহাড়ের পাদদেশের এই সমতল খণ্ডটিতে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে আজকের শিলিগুড়ির যাত্রা।

১৮৭৮ সালে নর্থ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে মিটার গেজ লাইন শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার সময়টাকে আজকের শিলিগুড়ির জন্মসন ধরা যেতে পারে। কারণ ওই সময়েই প্রয়োজন হতে থাকে শিলিগুড়ির ভৌগলিক অবস্থানের। ১৮৮১ সালে শিলিগুড়ি মৌজা ও তার সংলগ্ন কিছু এলাকা জলপাইগুড়ি থেকে আলাদা করে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং একই সময়ে তরাই মহকুমার সদর দপ্তর হাঁসখোওয়া থেকে সরিয়ে এনে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। শিলিগুড়িতে নিযুক্ত করা হয় একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে। তিনি ছিলেন কার্শিয়াং মহকুমা শাসকের অধীন।

১৯০৭ সালে তরাই মহকুমার অন্তর্গত অঞ্চলকে কার্শিয়াং মহকুমা থেকে পৃথক করে গঠন করা হল শিলিগুড়ি মহকুমা। ১৯০১ সালের জনগণনায় শিলিগুড়ির জনসংখ্যা ছিল ৭৮৪। এর মধ্যে ছিল রেল দপ্তরের কাজে আসা কিছু বাঙালি। ভিন্প্রদেশের কিছু ঠিকাদার ও শ্রমিক আর স্থানীয় রাজবংশী ও হাতে গোনা কয়েক ঘর নেপালি।

১৯১৬ সালে দার্জিলিং মহকুমা থেকে ডালিংকোটকে পৃথক করে গঠন করা হল কালিম্পং মহকুমা। তখনও শিলিগুড়ি বলতে গেলে তিন বর্গমাইল আয়তনের ছোট্ট একটা গ্রাম। ১৯০৫ সালে দার্জিলিং জেলাকে ভাগলপুর বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করলেও ১৯১২ সালে এই জেলাকে আবার রাজশাহী বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করা হল। ১৯৩৮ সালে ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী শিলিগুড়িতে স্থাপিত হয়েছিল একটি ইউনিয়ান বোর্ড।

সমুদ্রতল থেকে ৩৯২ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ভৌগলিক অবস্থানে শিলিগুড়ির অক্ষংশ ২৬ ডিগ্রি-৪৩ ফুট উত্তর এবং ৮৮ ডিগ্রি-২৬ ফুট দ্রাঘিমায় অবস্থিত। জেলা সদর দপ্তর দার্জিলিং থেকে সড়ক পথে এর দূরত্ব (হিলকার্ট রোড ধরে) প্রায় ৮০ কিমি। রেলপথে এই দূরত্ব ৮২ কিম।

শিলিগুড়ি নামের উৎপত্তি সম্পর্কে দ্বিমত থাকলেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান নামকরণের পেছনে তিব্বতীয়-ভুটানি-লেপচা-রাজবংশী উচ্চারণের যে মিলিত ফল সেটা শিলিগুড়ির নামের পেছনে আছে বলে বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন। তবে তাঁদের মধ্যেও আছে দ্বিমত।

ডা. চারুচন্দ্র সান্যাল শিলিগুড়ি নামের উৎপত্তির কথা বলেছেন শিলা থেকে। রাজবংশী ভাষায় গুড়ির অর্থ স্থান বা হাট। অর্থাৎ এখানে প্রচুর পাথর বা শিলা পাওয়া যেত বলে এই নাম। শ্রদ্ধেয় চারু সান্যালের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে এই প্রতিবেদক একমত হতে পারছেন না।

শিলিগুড়ি শব্দের দুটি ভাগ। শিলি এবং গুড়ি। লেপচা ভাষায় শিলি শব্দের অর্থ যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। লেপচারা যে শীতকালে মহানন্দা উপত্যকায় তাদের মোষ-ছাগল নিয়ে নেমে আসত তার প্রমাণ সুকনার ঠিক আগে রংটং। এটি পুরোপুরি লেপচা শব্দ। তাই শিলিগুড়ি নামের পেছনে লেপচাদের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। পরে রাজবংশীরা যখন এখানে বসবাস করতে এল তখন তারা শিলি শব্দের সঙ্গে গুড়ি শব্দটি যোগ করেছিল বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে। কারণ

রাজবংশীদের স্থান নামে গুড়ি প্রত্যয় পাওয়া যায়। যেমন, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, লাটাগুড়ি ইত্যাদি। অর্থাৎ এই অঞ্চল যে আর্য-কিরাত-মোঙ্গল সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্ররূপে গড়ে উঠেছিল তা এখানকার জায়গাগুলির নামকরণ থেকেই স্পষ্ট।

১৯৩৮ সালের ১৬ই মার্চ শিলিগুড়ির জন্য গঠন করা হল ইউনিয়ান বোর্ড। এর সভাপতি হিসাবে নিয়োগ করা হয় জর্জ মেহবাটকে। শিলিগুড়ির জনসংখ্যা তখন ৮৫৪৯ জন। ১৯৪৯ সালে ৮টি ওয়ার্ড নিয়ে হিলকার্ট রোডের এক ভাড়া বাড়িতে স্থাপিত হয়েছিল শিলিগুড়ির পুরসভার প্রথম কাজ। পুরসভার প্রথম পুরপ্রধান ছিলেন মহকুমা শাসক এস এম গুহ। উপপ্রধান ছিলেন ডা. ব্রজেন্দ্র বসু রায়চৌধুরী। ১৯৫৭ সালে নির্বাচিত পুরপ্রধান হলেন জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। উপ-পুরপ্রধান হয়েছিলেন পঞ্চানন তালুকদার। জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য বিধানসভায় নির্বাচিত হলে পুরপ্রধান হয়েছিলেন জীবনকৃষ্ণ দত্ত। পরবর্তী পুরপ্রধানরা ছিলেন যথাক্রমে কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, স্বপন সরকার, অশোক ভট্টাচার্য, বিকাশচন্দ্র ঘোষ, গঙ্গোত্রী দত্ত এবং আবার অশোক ভট্টাচার্য।

১৮৯৫ সালে ডিআই ফান্ড হাটে (আজকের পুরাতন বাজার) স্কট মিশন যে প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেছিল সেটাই শিলিগুড়ির প্রাচীনতম স্কুল। শিলিগুড়িতে প্রথম ডাকঘর স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে।

একটা এলাকার উন্নয়নের অন্যতম সূচক হচ্ছে সেখানকার শিক্ষার অবস্থা। ১৯০১ সালে শিলিগুড়ির জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭৮৪, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ শিলিগুড়ি ছিল তখনও এক ক্ষুদ্র জনপদ। শিক্ষার ক্ষেত্রও ছিল আরও শোচনীয়। আশপাশের এলাকা থেকে অনেক পিছিয়ে। ১৮৬৫ সালে তরাই অঞ্চলে যে প্রথম স্কুল স্থাপিত হয়েছিল সেটি ছিল ফাঁসিদেওয়ায়। ডব্লু ডব্লু হান্টার লিখিত 'আ স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল' ভলিউম ১০ থেকে জানা যায়, ১৮৭৩ সালে যে মধ্য ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল সেটি স্থাপিত হয়েছিল বাগডোগরার কাছে। ছাত্র সংখ্যা ছিল ২১ জন।

১৯০৭ সালে শিলিগুড়িকে মহকুমায় রূপান্তরিত করলেও শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থার খুব একটা উন্নতি ঘটেনি। বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত দার্জিলিং তরাই অঞ্চলের ছাত্রসংখ্যা ছিল সব মিলিয়ে ৬৬০।

শিলিগুড়ি হাট ও তৎসংলগ্ন জমি ছিল রেল দপ্তরের অধীন। ১৮৮৭ সালে এই জমি দার্জিলিং ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ডের নামে হস্তান্তর করা হয়। এই জমিতেই পূর্বে উল্লেখিত প্রথম প্রাথমিক স্কুল গড়ে তুলেছিলেন এক প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজক রেভারেন্ড ফাদার তুলস।

১৮৯৮ সালে শিলিগুড়িতে যে প্রাথমিক স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল সেটিই আজ শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল রূপে খ্যাত। এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩৫ জন। শিক্ষকের সংখ্যা ১৩। তাদের বেতন দেওয়া হত চাঁদা সংগ্রহ করে। ১৯১২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছিল তিন জন ছাত্র। এরা সবাই উত্তীর্ণ হয়েছিল।

১৯২৯ সালের ৩০ শে জুলাই শিলিগুড়ির আনন্দময়ী কালীবাড়িতে এক সভায় এখানে একটা মেয়েদের স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেটাই আজ জ্যোৎস্নাময়ী বালিকা বিদ্যালয়।

(চলবে)

অবশেষে হেরিটেজ ডিগ্রি লাভ কোচবিহারের হারানো গৌরব কি ফিরিয়ে দিতে পারবে?

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

গণতন্ত্রের সত্তর বছর পেরোবার পর 'হেরিটেজ' তকমা পাওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজনগর কোচবিহার। ঝলমলে রাজকীয় অতীত যে শহরের গায়ে বিবর্ণ আলখাল্লা হয়ে ঝুলে আছে, বহুদিন অভিভাবকহীন যে শহরের মনন নির্বিকারত্বের চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। যে শহরে পথিকের জন্য কোনও পথ নেই, কোনও মুক্তমঞ্চ নেই, কবির কলমে ব্যথা কিংবা বারুদ নেই। অমিয়ভূষণ নেই, সুরেলা কিংবা প্রতিবাদের কোনও কণ্ঠ নেই। কাঁধে হেরিটেজ 'স্টার' লাগিয়ে রঙ্চটা জোব্বার বুড়ো কোচবিহার কি আদৌ উঠে দাঁড়াতে পারবে জমে থাকা পুরনো পাঁকের নর্দমা থেকে? সত্যিই কি এইবার একটা বদলের ঈঙ্গিত পেয়েছে কোচবিহার?

ক্ষমতার উত্থান পতন ও অবহেলায় বেশ কিছু নিদর্শন কিছু হারিয়ে গেছে, কিছু হারিয়ে যেতে বসেছে। কিছু আবার এখনও মাথা উঁচু করে টিকে রয়েছে ঝড় ঝাপটা সামলে। গোটা জেলা জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সেই সব নিদর্শনগুলিকে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় গলা চড়িয়েছে কোচবিহারের সাধারণ মানুষ। এগুলি তাদের আবেগের জায়গা। অনেক আলাপ-আলোচনা ক্ষেত্র-পর্যবেক্ষণ করার পর পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন গত ৫ জুলাই ২০১৯, একটা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কোচবিহার শহরের ১৫৫টি নিদর্শনকে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করেছে। ১৫৫টির মধ্যে ১১০টি সরকারি ও ৪৫টি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। স্থানীয় মানুষের কথায়, এত বছরে তাদের আবেগ কিছুটা হলেও মূল্য পাবে। যদিও সেইসব বাড়ি ঘর, অফিস, মন্দির, দিঘিগুলির বেশির ভাগেরই অবস্থা খুব একটা ভাল নয়।

২০১১ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সারা উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনগুলির মধ্যে কোনটা কোনটা হেরিটেজের মর্যাদা পেতে পারে তার একটা সমীক্ষা করেছিলেন। তাঁরা একটা লিস্ট পরবর্তীতে রাজ্য সরকারের কাছে জমাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তা নিয়ে সরকারি তরফে তেমন কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায় নি। ২০১৭ সালে একবার কোচবিহারে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই শহরকে হেরিটেজ শহরের মর্যাদা দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তার পরেই শুরু হয় এই বিষয় নিয়ে কর্মকাণ্ড। খড়গপুর আইআইটি থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল কোচবিহারে আসেন। জুলাই ২০১৭ থেকে জুলাই ২০১৮ র মধ্যে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের সার্ভে করতে পাঁচবার কোচবিহারে আসেন। আপাতত তাঁরা শুধুমাত্র কোচবিহার শহর পুরসভা এলাকার মধ্যে থেকেই ১৫৫ টি নিদর্শনকে চিহ্নিত করেছে।

হেরিটেজের তালিকা

১) ডাঙ্গরআই মন্দির ও ডাঙ্গরআই দিঘি, ওয়ার্ড নং ১। ২) গুঞ্জবাড়ি, ওয়ার্ড নং ১। ৩) পলিটেকনিক দিঘি, ওয়ার্ড নং ১। ৪) পিয়াজবাড়ি মসজিদ, ওয়ার্ড নং ২। ৫) সরকার বাড়ির দিঘি, ওয়ার্ড নং ২। ৬) কলাবাগান চক্কর দিঘি, ওয়ার্ড নং ৩। ৭) নীলকুঠির সাইট, ওয়ার্ড নং ৪। ৮) জেলা শাসকের বাংলো, ওয়ার্ড নং ৪। ৯) কিংস হ্যাঙ্গার, ওয়ার্ড নং ৪। ১০) সুইডিশ মিশনারী, ওয়ার্ড নং ৪। ১১) কোচবিহার গভর্নমেন্ট স্কুল ফর দা ব্লাইন্ড, ওয়ার্ড নং ৪। ১২) কবরস্থান/ ইউরোপিয়ানদের সমাধি ক্ষেত্র, ওয়ার্ড নং ৪। ১৩) গোলাপ পট্টি শিব মন্দির, ওয়ার্ড নং ৫। ১৪) শিব বাড়ি দিঘি, ওয়ার্ড নং ৬। ১৫) অনন্তনাথ শিব মন্দির, ওয়ার্ড নং ৬। ১৬) অনাথ আশ্রম/কাবেরী বসুর বাড়ি, ওয়ার্ড নং ৬। ১৭) সাঁওতাল দিঘি, ওয়ার্ড নং ৬। ১৮) প্রিয়গঞ্জ ধোপা দিঘি, ওয়ার্ড নং ৬। ১৯) রাজমাতা মন্দির, ওয়ার্ড নং ৭। ২০) রাজমাতা দিঘি, ওয়ার্ড নং ৭। ২১) ভট্টাচার্য বাড়ি, ওয়ার্ড নং ৭। ২২) আনন্দ ভবন, ওয়ার্ড নং ৭। ২৩) সিপাই পাড়া দিঘি/ ভট্টাচার্য দিঘি। ওয়ার্ড নং ৭। ২৪) বৌ দিঘি/বনিক দিঘি, ওয়ার্ড নং ৭। ২৫) কাইয়া দিঘি/মারোয়াড়ি দিঘি, ওয়ার্ড নং ৭। ২৬) কবিরাজখানা, ওয়ার্ড নং ৭। ২৭) ভনোয়ার লাল বোকারিয়ার বাড়ি, ওয়ার্ড নং ৮। ২৮) কবিরাজ বাগান, ওয়ার্ড নং ৮। ২৯) ভবানীগঞ্জ বাজার, ওয়ার্ড নং ৮। ৩০) হেরিটেজ আর্কেড, ওয়ার্ড নং ৮। ৩১) দত্ত পোদ্দার বাড়ি ও দিঘি,ওয়ার্ড নং ৮। ৩২) কালীসচরন মন্দির, ওয়ার্ড নং ৮।৩৩) বাতাস সর্দার মসজিদ, ওয়ার্ড নং ৮।৩৪) সরকারি প্রেস, ওয়ার্ড নং ৮। ৩৫) পাওয়ার হাউস, ওয়ার্ড নং ৮। ৩৬) রাজকীয় জলাধার, ওয়ার্ড নং ৮। ৩৭) বিজলী ভবন/আসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ারের আবাসন পিডব্লিউডি, ওয়ার্ড নং ৮। ৩৮) নরেন্দ্র নারায়ণ পার্ক ও দিঘি, ওয়ার্ড নং ৮। ৩৯) কামেশ্বরী দিঘি/পুরাতন ধোপা দিঘি/খালাসি পট্টি দিঘি, ওয়ার্ড নং ৮। ৪০) ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিস, জলদাপাড়া, ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশন, কোচবিহার, ওয়ার্ড নং ৯। ৪১) বনশ্রী আবাসন, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, কোচবিহার,

ওয়ার্ড নং ৯। ৪২) আডিশনাল ডিভিশিনাল ফরেস্ট অফিসারের আবাসন, ওয়ার্ড ন ৯। ৪৩) ডিভিশিনাল ফরেস্ট অফিসারের আবাসন, ওয়ার্ড নং ৯। ৪৪) সরকারী বাংলো, ওয়ার্ড নং ৯। ৪৫) অতিরিক্ত জেলাশাসকের বাংলো (ডেভলপমেন্ট), ওয়ার্ড নং ৯। ৪৬) অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বাংলো, ওয়ার্ড নং ৯। ৪৭) ডাব্লুবি এসইডিসিএল আবাসন, ওয়ার্ড নং ৯। ৪৮) এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পি ডাব্লু ডি, ওয়ার্ড নং ৯। ৪৯) এডিএম ও এইও (সিবিজেডপি) বাংলো, ওয়ার্ড নং ৯। ৫০) সি এম ও এইচ এর বাংলো, ওয়ার্ড নং ৯।

৫১) ডিভিশিনাল ফরেস্ট অফিসারের বাংলো (আই এফ এস), ওয়ার্ড নং ৯। ৫২) জেলা পুলিশ সুপারের বাংলো, ওয়ার্ড নং ৯। ৫৩) গনকের দিঘি, ওয়ার্ড নং ৯। ৫৪) কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশন, ওয়ার্ড নং ১০। ৫৫) গঙ্গা বিষ্ণু ঠাকুর বাড়ি ও শিব দিঘি, ওয়ার্ড নং ১০। ৫৬) অশ্রুমান দাসগুপ্তের বাড়ি, ওয়ার্ড নং ১৩। ৫৭) রামকৃষ্ণ মঠ, ওয়ার্ড নং ১৩। ৫৮) বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ, ওয়ার্ড নং ১৩। ৫৯) হরি সভা, ওয়ার্ড নং ১৩। ৬০) মালী দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৩। ৬১) রূপসী দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৫। ৬২) নিত্যানন্দ আশ্রম, ওয়ার্ড নং ১৫। ৬৩) কালিকাদাস বাজার দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৬। ৬৪) কালিকাদাস বাজার, ওয়ার্ড নং ১৬। ৬৫) বাক্সি বাড়ি/জিলা পরিষদ অফিস, ওয়ার্ড নং ১৬। ৬৬) বক্সি বাড়ি দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৬। ৬৭) সানি কটেজ/ইন্দিরা নারায়ণের বাড়ি, ওয়ার্ড নং ১৬। ৬৮) কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের বাড়ি (জুনিয়র)/ হ্যান্ডলুম অফিস, ওয়ার্ড নং ১৬। ৬৯) কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের ঠাকুর বাড়ি (জুনিয়র)। ৭০) জ্যোতিন্দ্র নারায়নের বাড়ি (কাছুয়া সাহেব), ওয়ার্ড নং ১৬। ৭১) বৈরাগী দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৭। ৭২) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ/ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ, ওয়ার্ড নং ১৭। ৭৩) কোচবিহার ক্লাব, ওয়ার্ড নং ১৭। ৭৪) রাসমেলা মাঠ, ওয়ার্ড নং ১৭। ৭৫) পুরনো পি ডাব্লু ডি বিল্ডিং ও বর্তমান পি ডাব্লু ডি রোড ক্যাম্পাস, ওয়ার্ড নং ১৭। ৭৬) চন্দন দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৭। ৭৭) জেঙ্কিন্স স্কুল, ওয়ার্ড নং ১৭। ৭৮) আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ কলেজ, ওয়ার্ড নং ১৭। ৭৯) রাজগুন বোর্ডিং/ কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ হস্টেল, ওয়ার্ড নং ১৭। ৮০) বানী ভবন, ওয়ার্ড নং ১৭। ৮১) মাহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ বয়েজ হস্টেল, ওয়ার্ড নং ১৭। ৮২) সার্কিট হাউজ, ওয়ার্ড নং ১৭। ৮৩) ডাকবাংলো, ওয়ার্ড নং ১৭। ৮৪) জেলখানা ও জেলখানা দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৭। ৮৫) পুলিশ ক্লাব, ওয়ার্ড নং ১৭। ৮৬) পুলিশ লাইন, ওয়ার্ড নং ১৭। ৮৭) পুলিশ লাইন দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৭। ৮৮) পুরানো গার্ড কোয়ার্টার/ মডেল ডেয়ারী/ পুলিশ হসপিটাল, ওয়ার্ড নং ১৭। ৮৯) পুরানো মিলিটারী মসজিদ, ওয়ার্ড নং ১৭। ৯০) কোচবিহার মৎস দপ্তরের দিঘি ১, ওয়ার্ড নং ১৭। ৯১) কোচবিহার মৎস দপ্তরের দিঘি ২, ওয়ার্ড নং ১৭। ৯২) কোচবিহার মৎস দপ্তরের দিঘি ৩, ওয়ার্ড নং ১৭। ৯৩) তোপ খানা/ ম্যাগাজিন রুম, ওয়ার্ড নং ১৭। ৯৪) নিউ সিনেমা, ওয়ার্ড নং ১৭। ৯৫) ওল্ড মিউনিসিপালিটি অফিস, ওয়ার্ড নং ১৮। ৯৬) খাসমহল অফিস/ ডিস্ট্রিক্ট রিফুজি রিলিফ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অফিস/ রেভিনিউ ইন্সপেক্টরের অফিস, ওয়ার্ড নং ১৮। ৯৭) দিলখুশ ভবন/ডেপুটি লেবার কমিশনারের অফিস, ওয়ার্ড নং ১৮। ৯৮) সেন্ট্রাল কটেজ, ওয়ার্ড নং ১৮। ৯৯) সাবিত্রী লজ, ওয়ার্ড নং ১৮। ১০০) সাহিত্য সভা, ওয়ার্ড নং ১৮।

ল্যান্সডাউন হল

১০১) জয় কুটির, ওয়ার্ড নং ১৮। ১০২) কমলা কুটির, ওয়ার্ড নং ১৮। ১০৩) লক্ষ্মী কুটির, ওয়ার্ড নং ১৮। ১০৪) দেব বক্সি বাড়ি, ওয়ার্ড নং ১৮। ১০৫) সুনীতি একাডেমী, রাহা দিঘি ও সুনীতি একাডেমী দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৮। ১০৬) হেড মিস্ট্রেসের আবাসন, সুনীতি একাডেমী, ওয়ার্ড নং ১৮। ১০৭) তরফদার দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৮। ১০৮) জে সি রায়ের বাড়ি, ওয়ার্ড নং ১৮। ১০৯) কল্যান ভবন/ মোতি মহল, ওয়ার্ড নং ১৮। ১১০) পারিজাত ভিলা/ ডিস্ট্রিক্ট জাজ বাংলো, ওয়ার্ড নং ১৮। ১১১) কেদার কুটির, ওয়ার্ড নং ১৮। ১১২) ভোলা আশ্রম, ওয়ার্ড নং ১৮। ১১৩) কেশব আশ্রম, ওয়ার্ড নং ১৮। ১১৪) চন্দ্র বাড়ি ও চন্দ্র বাড়ি দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৮। ১১৫) দেবা বক্সি বাড়ির দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৮। ১১৬) কোচবিহার রাজবাড়ি, রাজবাড়ি ঝিল, সারপেন্টাইন দিঘি ২ ও মহারানী দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৯। ১১৭) রাজবাড়ি হেরিটেজ উদ্যান দিঘি /সারপেন্টাইন দিঘি ১, ওয়ার্ড নং ১৯। ১১৮) ধোপা দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৯। ১১৯) গোলাপ দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৯। ১২০) বড়ো দেবীবাড়ি, ওয়ার্ড নং ১৯। ১২১) লম্বা দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৯। ১২২) সাগর দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৯। ১২৩) ল্যান্স ডাউন হল, ওয়ার্ড নং ১৯। ১২৪) হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির, ওয়ার্ড নং ১৯। ১২৫) ভিক্টর প্যালেস/ রাজবংশী ভাষা একাডেমি, ওয়ার্ড নং ১৯। ১২৬) লাল বাগ/ সি এম ও এইচ অফিস ও নতুন বি এস এন এল অফিস, ওয়ার্ড নং ১৯। ১২৭) মোটর ভেইকেল অফিস/ পুলিশ কোর্ট, ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্ট ও ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্টার অফিস, ওয়ার্ড নং ১৯। ১২৮) বার অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড লাইব্রেরী, ওয়ার্ড নং ১৯, ১২৯) এস ডি ও অফিস, সদর, ওয়ার্ড নং ১৯। ১৩০) ট্রেজারী বিল্ডিং, ওয়ার্ড নং ১৯। ১৩১) ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিস, ওয়ার্ড নং ১৯। ১৩২) সুরেশ মুস্তাফীর বাড়ি, ওয়ার্ড নং ১৯। ১৩৩) মুস্তাফি বাড়ির দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৯। ১৩৪) সাহা বাড়ি, ওয়ার্ড নং ১৯। ১৩৫) নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির, ওয়ার্ড নং ১৯। ১৩৬) আনন্দ আশ্রম/ ডি এস পি বাংলো, ওয়ার্ড নং ১৯। ১৩৭) ইরিগেশন অফিস দিঘি, ওয়ার্ড নং ১৯। ১৩৮) লাল দিঘি, ওয়ার্ড নং ২০। ১৩৯) সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাংক, ওয়ার্ড নং ২০। ১৪০) নতুন মসজিদ, ওয়ার্ড নং ২০। ১৪১) আর্টিজেন স্কুল / পাবলিক ওয়ার্কস ওয়ার্কশপ, ওয়ার্ড নং ২০। ১৪২) কয়েদি খোঁড়া দিঘি/ বি পি তালুকদার দিঘি, ওয়ার্ড নং ২০। ১৪৩) নরসিংহ দিঘি, ওয়ার্ড নং ২০। ১৪৪) রায় বাড়ি, ওয়ার্ড নং ২০। ১৪৫, মদন মোহন বাড়ি, ওয়ার্ড নং ২০। ১৪৬) আনন্দময়ী ধর্মশালা, ওয়ার্ড নং ২০। ১৪৭) এম জে এম হাসপাতাল, ওয়ার্ড নং ২০। ১৪৮) হেড পোস্ট অফিস, ওয়ার্ড নং ২০। ১৪৯) এম জে এম ক্লাব, ওয়ার্ড নং ২০। ১৫০) ভেটেনারী হসপিটাল, ওয়ার্ড নং ২০। ১৫১) সেন বাড়ি, ওয়ার্ড নং ২০। ১৫২) আব্বাস উদ্দিন আহমেদের বাড়ি, ওয়ার্ড নং ২০। ১৫৩) আহসানউল্লা আহমেদের বাড়ি, ওয়ার্ড নং ২০। ১৫৪) কোতওয়ালি থানা অফিস চত্বর, ওয়ার্ড নং ২০। ১৫৫) চিলা রায় মিলিটারি ব্যারাক, কমপ্লেক্স, ব্যারাক দিঘি, ওয়ার্ড নং ২০।

উপরের বিভিন্ন নিদর্শনগুলি সদ্য হেরিটেজ তকমা পেলেও এর সলতে পাকানো চলছিল বেশ কয়েক বছর ধরে। একটু বেশিই সময় লেগে গেল বলে মত অনেকের। তকমাপ্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে সাবিত্রী লজ ধ্বংসের মুখে। লাল দিঘিসহ বেশ কয়েকটি দিঘি ইতিমধ্যেই অনেকটা করে বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। বাকি দিঘিগুলি সারা বছরই প্রায় আবর্জনায় ভরে থাকে। মহকুমা শাসকের অফিস, দিলখুশ ভবনসহ বেশ কিছু দপ্তর খুব দ্রুত পরিচর্যা করা দরকার। ভবনগুলির গায়ে গাছ গজিয়ে গিয়ে তা ভবনের ক্ষতি করছে। শহরবাসির আশংকা হেরিটেজের মর্যাদা পেতেই দুটো বছর কেটে গেল। এবার কাজ শুরু করতে না জানি কত সময় বয়ে যাবে। এদিকে হেরিটেজ তকমাপ্রাপ্ত নিদর্শনগুলি নিয়ে কারও কোনও সমস্যা বা মতামত থাকলে সে যাতে তার মতামত জানাতে পারে, তার জন্য পুরসভাতে একটি বিশেষ সেল খোলা হয়েছে এক মাসের জন্য। এরপর ডিস্ট্রিক্ট হেরিটেজ কমিটি সেই মতামত, সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তাদের বক্তব্য ওয়েস্ট বেঙ্গল হেরিটেজ কমিশনকে জানাবে। সবশেষে বিভিন্ন দপ্তরের সাথে আলোচনা করে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেরিটেজ কমিশন তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। এই ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলির যদি হঠাৎ করেই জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা দরকার হয়ে পড়ে, সেই পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসনের হাতে আপৎকালীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কতটা ক্ষমতা থাকবে সেই বিষয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট করে কিছু জানা যাচ্ছে না। ফলে হেরিটেজ তকমার শিকে ছিঁড়লেও কোচবিহারের এই ঐতিহ্যগুলো কতদিনে ঠিকঠাক ভাবে সংরক্ষিত হবে তাই নিয়ে আশা আশংকার দোলাচলে কোচবিহারবাসী। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হল, শহরের দেখভাল করবার দায়িত্বে থাকা জনপ্রতিনিধিরা কি ঐক্যমতে এসে মডেল হেরিটেজ শহর গড়ে তোলার ব্যাপারে কতটা সক্রিয় হবেন? উৎসব কাল পেরোলেই পুর নির্বাচনের কড়া নাড়া। স্থানীয় নাগরিকের মন্তব্য, বেকায়দায় চলে যাওয়া শাসকদল নিশ্চয়ই চাইবেন না সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনের ফলের পুনরাবৃত্তি হোক! সেক্ষেত্রে 'হেরিটেজ' কর্মকাণ্ড দ্রুত শুরু হয়ে যাবে আশা করা যায়।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

নেতা বা পণ্ডিতের ভরসায় নয়

নদী বাঁচাতে মানুষকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়

জয়ন্ত গুহ

একটা গভীরতর সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে ভারতবর্ষ সহ গোটা পৃথিবী। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের পর গোটা পৃথিবী তাঁর সুফল পেতে শুরু করে কিন্তু পাশাপাশি সম্মুখীন হয় এক ভয়ানক সমস্যার। ইংল্যান্ডের ভোগবাদকে চরিতার্থ করতে শৃঙ্খলিত হয় গোটা পৃথিবী। বিষিয়ে যায় গোটা পৃথিবীর পরিবেশ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ভারতবর্ষ। এদেশে পরিবেশের পাশাপাশি বিপন্ন হয় হাজার বছরের সংস্কৃতি। "যাহাতে অমৃত নাই তাহা লইয়া আমরা কী করিব" — ভারতবর্ষের এই চিরায়ত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত ছিল শিল্পবিপ্লবের বিষময় দর্শন। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে নি। আধ্যাত্মিক বোধ ছাড়া বোঝা সম্ভবও নয়। ভারতবর্ষ থেকে সম্পদ লুঠ করে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব হচ্ছে তখন এবং একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের স্বার্থে ভারতবর্ষের উন্নয়নের মডেল তৈরি হল, যা কিনা প্রতিদিন বিষিয়ে দিয়েছে এদেশের মাটি, জল আর বাতাসকে। আক্ষেপ করে গান্ধীজি বলছেন, "আমি কক্ষনো চাই না আমার মাতৃভূমি, আমার দেশ ইউরোপের মত শিল্পোন্নত হয়ে তাঁদের মত জীবনযাপন করুক। আমি যদি ওইভাবে জীবনযাপন করি, তাহলে ধানের ক্ষেতে পঙ্গপাল পড়লে যেমন সব রিক্ত হয়ে যায় তেমনি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে এই সভ্যতা"।

ইউরোপ এবং আমেরিকার অন্ধ অনুকরণে, হিমালয়ের ভঙ্গুর ভূগোলে তিস্তা নদীর ওপর অজস্র বাঁধ দিয়ে আমরা যদি ভাবি, প্রকৃতিকে জয় করে ফেলেছি তাহলে ভুল ভাবছি। শিলিগুড়ির মহানন্দা, জলপাইগুড়ির করলা, কোচবিহারের তোর্সা এবং বালুরঘাটের আত্রেয়ী-তে যদি প্রতিদিন বর্জ্য ফেলে বা কৃত্রিম উপায়ে নদীর গতি আটকে, নোংরা নালায় পরিণত করি বা নদীখাত যদি শহরের থেকে উঁচু হয়ে যায় তাহলে একনাগাড়ে অধিক বর্ষণে নদীখাত থেকে জল উপচে ভাসবে শহর। আর আবর্জনায় বাধা পেয়ে নদী যদি গতিপথ পরিবর্তন করে শহরে ঢোকে তাহলে ক্ষতির পরিমাণ ভাবতে পারছেন? নদীনালাময় উত্তরবঙ্গের পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে সরকার, পুরসভা বা পরিবেশ দূষণ বোর্ডের একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত সাধারণ মানুষ নিজের মাটি, শহর এবং ভূগোলকে আধ্যাত্মিক চেতনায় দেখছে।

কৃষিভিত্তিক উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন নদীপুজার নাচগানের রীতি রেওয়াজ রয়েছে, লেপচা তামাং ভুটিয়াদের মধ্যেও তার প্রাবল্য আরও বেশি। সেই উৎসবগুলিকে আবার যদি জনপ্রিয় করা যায় এবং গান্ধীজির মত 'ছোটদের কাছ থেকে যে মাটি আমরা ধার নিয়েছি সেই মাটিকে আবার তাঁদের বাসযোগ্য করে ফিরিয়ে দেওয়া'-র জন্য আমরা যদি আমাদেরই দেশের জগৎবিখ্যাত এক সন্ন্যাসীর সেবামন্ত্রে নিজেদের দীক্ষিত করতে পারি। গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ বা নেতাজি— সবার কাছেই তিনি ছিলেন শ্রদ্ধেয়। ২০১৩ সালে ছিল তাঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী। প্রয়াত হয়েছেন ১৯০২ সালে। রাজা-গজা কেউ নন। নিদেনপক্ষে মন্ত্রী বা নেতা! না, তাও ছিলেন না। ছিলেন সামান্য এক ভারতীয় সন্ন্যাসী। অথচ মৃত্যুর এত বছর পরও তাঁকে কেউ ভুলতে পারছে না। শুধু ভারতবর্ষে নয়, আমেরিকা এবং ইউরোপেও তিনি সমান জনপ্রিয়। কী করেছিলেন তিনি? সহজ ভাষায় বললে, একটি সহজ বিষয় সারাজীবন তিনি অনুসরণ করে গেছেন, সরকার বাহাদুর বা অন্য কারুর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বা অন্যের সমালোচনা না করে, কয়েকজন

সমমনস্ক মানুষকে জুটিয়ে নিয়ে মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়া। অর্থ, সরকারি সাহায্য, প্রতিপত্তি — কিছুই ছিল না তাঁর। শুধুমাত্র দেশকে ভালবেসে মানুষসেবার মন্ত্রে জগৎবিখ্যাত, ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

তাঁর দেশের তারকাখচিত 'ভদ্রলোক' নেতা-মন্ত্রী বা সেলেব্রিটিরা তাঁকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেন কিন্তু রোজ বুঝিয়ে দেন তাঁরা স্বামীজির ভাবনা থেকে বহুদূরে থেকে প্রতিদিন পিছিয়ে দিচ্ছেন দেশকে। নয়ত স্বাধীন দেশে, প্রবল বর্ষণে আটকে পড়া ১০৫০ জন ট্রেনযাত্রীকে ১৭ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় বিপদমুক্ত হতে। কেন একটি স্বাধীন উন্নত দেশে নাগরিকরা বিপদে পড়বেন প্রতিকূল আবহাওয়া বা অধিক বর্ষণে? আগাম সতর্কতার প্রযুক্তি নেই দেশে? কীসের জন্য আছে সরকার? চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে যাত্রা করেছে চন্দ্রযান-২ আর সেই সময়ে অধিক বর্ষনে রেললাইন জলের তলায় চলে যাওয়ায় সঙ্কটের মুখোমুখি ১০৫০ জন ভারতীয় নাগরিক! আটকে পড়া যাত্রীরা বাধ্য হন তাঁদের দুর্দশার ছবি মোবাইলে তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে। ঝাঁপিয়ে পড়ে টিভি-মিডিয়া। টনক নড়ে সরকার বাহাদুরের। শেষমেশ ১৭ ঘণ্টা বাদে, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং সেনা নামতেই, নিমেষে বিপদমুক্ত হন ১০৫০ জন তাঁরা। এদেশে সবকিছু আছে। অভাব শুধু সদিচ্ছা ও উদ্যোগের। রোজ আমরা পড়ি (বা পড়ি না) এবং ভুলে যাই, স্বামীজির একটি সহজ কথা, "অন্যকে দোষারোপ না করে আত্মসমালোচনা কর এবং দেখ তুমি নিজে কী করছ"। স্বামীজির এই আহ্বান দেশের 'ভদ্রলোক' এবং নেতা-মন্ত্রীরা ভুলে গেলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু ভোলেনি। দেশের সাধারণ মানুষ অতি সাম্প্রতিক নির্বাচনে, বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত নরেন্দ্র মোদীকে বিপুল সমর্থন জানিয়েছেন। আবার সেই

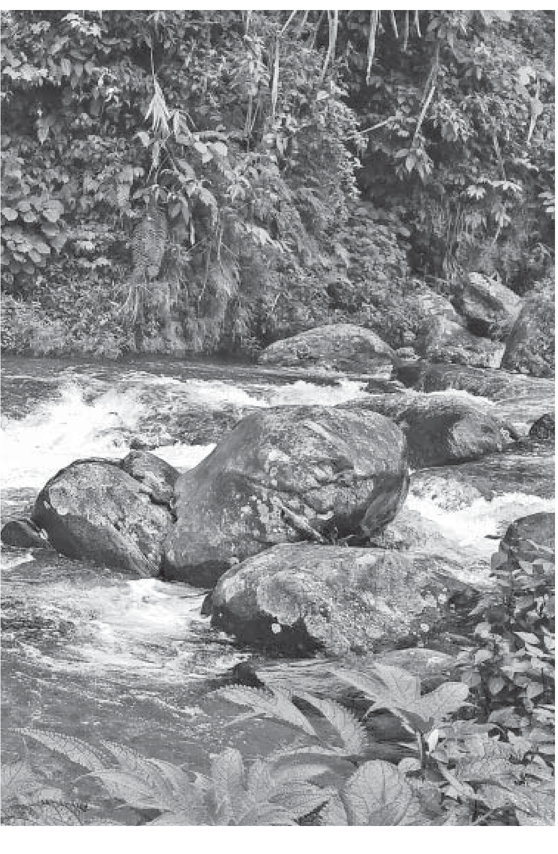

'দরিদ্র নারায়ণ' সাধারণ গ্রামের মানুষ সবার আগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল বর্ষণে আটকে পড়া রাজলক্ষী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের প্রতি। নেতা-মন্ত্রী-সরকার নয়, এই সাধারণ মানুষই দেশের শক্তি। এই সাধারণ মানুষই দেশের স্বাধীনতা এনেছিল। এই সাধারণ মানুষই উলটে দিয়েছে "রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা উন্নয়নের" মৌরসিপাট্টা। তবে এই সাধারণ মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে আছেন কিছু স্বার্থপর এবং অজ্ঞান মানুষ। তাঁদের জন্যেই জলপাইগুড়ির প্রাণরেখা করলা নদী বা শিলিগুড়ির মহানন্দা বিষাক্ত হয়, অবরুদ্ধ হয়, দুষিত হয় এবং নাব্যতা হারায়। এবং অধিক বর্ষণে ভাসায় শহর। তো কী করবেন? বসে থাকবেন? অপেক্ষা করবেন কবে কোন 'মসিহা' নেতা এসে ডুয়ার্সের জন্য কেঁদে বুক ভাসাবেন এবং আবারও যৌবনপ্রাপ্ত হবে করলা

ইউরোপ এবং আমেরিকার অন্ধ অনুকরণে, হিমালয়ের ভঙ্গুর ভূগোলে তিস্তা নদীর ওপর অজস্র বাঁধ দিয়ে আমরা যদি ভাবি, প্রকৃতিকে জয় করে ফেলেছি তাহলে ভুল ভাবছি। শিলিগুড়ির মহানন্দা, জলপাইগুড়ির করলা, কোচবিহারের তোর্সা এবং বালুরঘাটের আত্রেয়ী-তে যদি প্রতিদিন বর্জ্য ফেলে বা কৃত্রিম উপায়ে নদীর গতি আটকে বা নদীখাত যদি শহরের থেকে উঁচু হয়ে যায় তাহলে একনাগাড়ে অধিক বর্ষণে নদীখাত থেকে জল উপচে ভাসবে শহর।

নদী? মহানন্দা ফুসফুস হয়ে বইবে?

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমীক্ষা বলছে, করলা নদীর জলে মিশে রয়েছে বিপুল পরিমাণ ফেকাল কলিফর্ম ব্যাক্টেরিয়া। নদীদূষণই এর কারণ। করলা নদীর জলে নিত্য ফেলা হয় আবর্জনা, পশুর দেহাংশ, প্লাস্টিক প্রভৃতি। এতেই বিষিয়ে যাচ্ছে জল। গতি হারাচ্ছে নদী। মারা পড়ছে মাছ, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ। করলা নদীর জলে মিশে থাকা বিষ ফেকাল কলিফর্ম-র উৎস মূলত পশুর পচা দেহ। মূলত গবাদি পশুর দেহাংশ জমে জমে জলে এই বিষ ছড়িয়ে পড়ে। যেমন নদীর জলে বিষ মিশেছিল ২০১২ সালে। প্রাথমিক তদন্তে প্রশাসন জানতে পারে, শহর লাগোয়া কোনও চা-বাগান এলাকা থেকে প্রচুর কীটনাশক মিশে গিয়েছিল নদীর জলে। নিষিদ্ধ কীটনাশক এন্ডোসালফান জলে মিশেই রাশি রাশি মাছের মৃত্যু হয়েছিল করলায়। করলা নদীতে স্বাভাবিক স্রোত ফিরে না এলে এই বিষ থেকে মুক্তির কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞেরা। প্রথমত প্লাস্টিক থেকে শুরু করে যে কোনও আবর্জনা, বিশেষত মৃত প্রাণীর দেহাংশ এ সব নদীর জলে ফেলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

কিন্তু এই জ্ঞানগর্ভ বাণীতে কি বাঁচবে নদী? না। তাহলে উপায়? বরং গালমন্দ করা যাক রাজ্য সরকার এবং পুরসভাকে। তাতে কাজ না হলে ঝাল ঝাড়া যেতেই পারে, ৪৯ জন বুদ্ধিজীবী যারা অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রীকে। আর তাতেও কাজ না হলে, প্রবল ক্রোধে ফেটে পড়া নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতেও কি বাঁচবে করলা মহানন্দা?

'সাতেপাঁচে' না থাকা 'স্বার্থপর' এক বাঙালী হিসাবে এই নিবন্ধ এই বলে এখানেই শেষ করাই যেত যে "বিষ নিয়ে আরও কতদিন এ ভাবেই মৃত্যুনদী হয়ে বয়ে যেতে হবে জলপাইগুড়ির করলাকে, সে উত্তরও নেই কারও কাছে"। কিন্তু তা না করে যদি আমেরিকানদের মত ডিরেক্ট জার্নালিজমের পথে হাঁটি তাহলে ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব নিয়ে অনুরোধ করব, অন্তত যদি চার-পাঁচ জনও এগিয়ে আসেন তাহলে সবাই মিলে নদী পরিষ্কার করার কাজ শুরু করে দেওয়া যেতে পারে। মহারাষ্ট্রের গ্রামের মানুষজন যদি সবার আগে এগিয়ে আসতে পারেন রাজলক্ষী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের বিপর্যয় মুক্ত করতে তাহলে জলপাইগুড়ির সাধারণ মানুষও এগিয়ে আসবে করলাকে বিষমুক্ত করতে। খবরের কাগজে খবর হয়েছে, "করলাকে বিষমুক্ত করতে নামল সাধারণ মানুষ"। পালিয়ে বাঁচার পথ পাবেন না আমাদের সম্মানীয় অলস বাঙালী বুদ্ধিজীবী এবং নেতা-মন্ত্রীরা।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, করলাকে নয় সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে বাঁচাল। তিস্তা ও তোর্সার ক্ষেত্রে কী হবে? তিস্তা নিয়ে রাজনীতির সাতকাহন আছে এবং ভারত-ভুটান সীমান্তে তোর্সা দূষণে, সরাসরি না হলেও ভুটানের বেসরকারি প্রশ্রয় আছে। এই দুই নদীর ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কও যুক্ত। সেক্ষেত্রে তো দুই দেশ এবং রাজ্য প্রশাসনের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু হবে না। তাহলে কিম কর্তব্যম?

এখুনি প্রশ্ন উঠুক মহানন্দাকে নিয়ে। ২০১৯-র জুলাইয়ে ১৪টি বিরল প্রজাতির গাঙ্গেয় ডলফিনের দেখা মিলেছে বিহারে কিষাণগঞ্জ জেলায় প্রবাহিত মহানন্দায়। তার মানে সেখানকার জল এখনও শিলিগুড়ি'র পুতিগন্ধময় মহানন্দা (পড়ুন 'মহাগন্ধা')-র তুলনায় ভাল। লোকে বলে, বাম জমানায় ৩৪ বছর ধরে প্রতিদিন শিলিগুড়িতে মহানন্দা চুরি হয়েছে। প্লট করে বিক্রি হয়েছে মহানন্দার রিভারবেড। গত আট বছরে সে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন ঘটে নি। ১৫ কিমি জুড়ে নদীর বুকে হাজার হাজার বেআইনি দখলদার এবং অসংখ্য খাটালের বিপুল বর্জ্য প্রতিদিন মিশছে নদীতে। কারা এই নদীর বেআইনি দখলদার? কোথা থেকে এসেছে? নাগরিক হিসাবে তারা গণ্য হল কী করে? বড় ২০টি ড্রেন দিয়ে প্রতিদিন ৪০০ টন অপরিশোধিত আবর্জনা পড়ছে নদীতে। খুল্লামখুল্লা বালি তুলে নিয়ে যাচ্ছে বালি মাফিয়ারা। বাঁধ ও ব্যারেজ বানাতে গিয়ে নদীর দুপাশের গাছ উধাও। পুকুর নয়, একটা নদী ভরাট হয়েছে এবং হচ্ছে ভোটবাক্সের স্বার্থে। যে সে নদী নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ গঙ্গার প্রধান চার উপনদীর (যমুনা, গোমতী, দামোদর এবং মহানন্দা) একটি নদী।

শুরুটা বরং করলা এবং মহানন্দা থেকে হোক। তারপর সময়ই ঠিক করে দেবে পরবর্তী পথসুচী।

নদী ঘটিত বিপর্যয় মোকাবিলায় ডুয়ার্সের পাশে ইসরো ও জিএসআই

গৌতম চক্রবর্তী

প্রযুক্তি যখন শয়তানের রূপ ধারণ করে তখন তাকে ঠেকাতে ভগবানরূপে এগিয়ে আসে প্রযুক্তিই। এই মানব সভ্যতার অনিয়ন্ত্রিত বিস্তারে সাহায্য করেছে প্রযুক্তি। ফলে প্রকৃতি ক্রমশ ভারসাম্য হারিয়েছে। বেড়েছে বিষ গ্যাস এবং বেড়ে চলেছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। সমূহ বিপদ এড়াতে আবার সেই প্রযুক্তিরই দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এবং সাধারণ মানুষও টের পাচ্ছেন, চিরকালের চেনা জলবায়ু অচেনা ঠেকছে। ঝড় বিদ্যুৎ বৃষ্টি বন্যা খরা ঠান্ডা গরম সবই এখন চিরাচরিত নিয়ম বহির্ভূত, ক্যালেন্ডারকে কাঁচকলা দেখিয়ে যখন খুশি আসতে পারে, নাও আসতে পারে। ভূমিকম্পের এপিসেন্টারে থাকা ডুয়ার্স উপত্যকা প্রাকৃতিক বিরূপতার শিকার হয়ে চলেছে আজও, দুর্যোগের প্রবণতা বেড়েই চলেছে। না, কোনও রাজনৈতিক নেতার কাছে এর সুরাহা খোঁজার প্রত্যাশা করেন না উত্তরের মানুষ। তবু তারই মাঝে আনন্দের খবর হল, উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার লক্ষ্যে পরিকাঠামোগত এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'র সহযোগিতার আশ্বাস। চন্দ্রায়ণ-২ এর সৌজন্যে যে ইসরো-র নাম জানে সাধারণ মানুষ। কেবল মহাকাশে মানুষের কল্যাণে বা অকল্যাণে অজস্র কোটি ব্যয়ে দুনিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একের পর এক মহাকাশযান বানিয়ে পাঠানোই নয়, সেই একই বিজ্ঞান যে বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়াতেও পারে, এবার সেটাও ক্রমে বিশ্বাস করতে শুরু করবে মানুষ।

আমেরিকা কিংবা ইউরোপ নয়, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ধাক্কা সরাসরি এসে লেগেছে ভারতের গায়েও। এর ফলে আবহাওয়ায় যে অস্বাভাবিকতা এসেছে তা আর অস্বীকার করতে পারছেন না আবহবিদেরাও। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন ইসরোর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তথা সংস্থার পূর্ব ভারতের আঞ্চলিক 'রিমোট সেন্সিং সেন্টার'-এর অধিকর্তা ডক্টর জি শ্রীনিবাস রাও। উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার লক্ষ্যে পরিকাঠামোগত এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ইসরোর সহযোগিতা কীভাবে পাওয়া যেতে পারে এই বিষয়ক একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, মূলত অধ্যক্ষ অমিতাভ রায়ের উদ্যোগেই। সেখানে বিজ্ঞানী শ্রীনিবাস রাও এর কাছ থেকে জেনেছিলাম, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় যে কোনও ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রযুক্তিগত সাহায্য পাওয়া যেতে পারে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'র কাছ থেকে। ইসরোর সঙ্গে দুই জেলার তথ্য প্রযুক্তিগত সম্পর্ক বাস্তবায়িত হলে ডুয়ার্সে তথা গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে বন্যা এবং ভাঙ্গন প্রতিরোধে সুদুরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে সেচ, রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য পরিকাঠামো পরিকল্পনা ও তৈরির ধরনটাই আমূল বদলে যাবে। ইসরোর সাহায্যে জেলার মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজও ত্বরান্বিত হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উন্নত মেধাবিশিষ্ট আগ্রহী ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসরোর স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে প্রযুক্তিগত বিভিন্ন কাজে লাগানো সম্ভব হবে। যাকে বলা হয় 'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং' বা সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট।

ভুটান লাগোয়া দুই জেলাতেই বন্যা, নদীভাঙন এবং ধ্বস সম্পর্কিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাৎসরিক ঘটনা। অনেক সময় আগাম কোনও তথ্য না থাকার ফলে এতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সীমাহীন হয়ে পড়ে। জীবনহানির ঘটনাও ঘটে। চা বাগিচা অধ্যুষিত এই দুই জেলার সবচেয়ে বড় সমস্যা প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে এখনও সেইভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠা। এর সঙ্গে রয়েছে ভূবৈচিত্র্য অনুযায়ী ঠিক কী ধরনের পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজন তা সঠিকভাবে বোঝার বিষয়টিও। ইসরোর রিমোট সেন্সিং ব্যবস্থার মাধ্যমে এলাকায় ভূপৃষ্ঠের গঠন, ভূমিক্ষয়, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সমস্ত খুঁটিনাটি এক লহমায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেই তথ্য নিয়মিত হাতে পেলে পরিকল্পনা তৈরি এবং রূপায়নের সময় জেলা প্রশাসনের কাছে হাতের তালুর মতই চেনা হয়ে থাকবে সংশ্লিষ্ট এলাকা। এর ফলে উপযুক্ত পরিকল্পনা নেওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে। দুই জেলার কোথায় কোথায় টুরিস্ট হাব গড়ে তুললে তা সবদিক থেকেই নিরাপদ ও সুবিধাজনক হবে তা যেমন জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে ওই মহাকাশ সংস্থা বলে দিতে পারে, তেমনই কোথায় কোন নদীর পাড় ভেঙেছে কিংবা কোন নদী দিক পরিবর্তন করে জনপদের দিকে ধেয়ে আসছে সেসব তথ্য আগাম জানা সম্ভব হবে ইসরোর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে। ভুটান পাহাড় থেকে উত্তরবঙ্গে নেমে আসা নদীগুলিতে হড়কা বান এলে তাও আগাম জানানো সম্ভবপর হবে। ফলে ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। ডক্টর শ্রীনিবাস রাও এর সঙ্গে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনেরও আলাপচারিতা হয়েছিল সেই সময়ে।

জলপাইগুড়ি জেলা যেহেতু নিম্ন হিমালয় পাদদেশ অঞ্চল থেকে শুরু সেই কারণে এই জেলায় কোচবিহার সীমান্ত এবং বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠের এবং নদীখাতের ঢাল অত্যধিক বেশি হওয়ায় বন্যার সময়ে জনজীবন স্বাভাবিক কারণেই বিঘ্নিত হয়। যেহেতু তিস্তা এবং তার উপনদীগুলি বাদে আর সব নদীগুলির উৎস ভুটানের পাহাড়ি অঞ্চল তাই ভুটান এবং ভুটান পাহাড় সংলগ্ন বৃষ্টিপাত, সেখানকার পরিবেশ এবং ভূমিক্ষয়, বৃক্ষচ্ছেদন, ডলোমাইট সংগ্রহের জন্য পর্বতগাত্রে বিস্ফোরণ ইত্যাদি এখন আন্তর্জাতিক সমস্যা। ভুটানের পাহাড়ি অঞ্চলে জনবসতি বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট তৈরি, পাহাড়ি এলাকাগুলিকে ভঙ্গুর এবং অস্থিতিশীল করে দিয়েছে। হিমালয় এবং হিমালয় সংলগ্ন এলাকা ভূমিকম্প প্রবণ হবার ফলে এবং হিমালয়ের গঠনে প্রকৃতি অনুযায়ী ভূস্তরে স্থিতিশীলতার অভাব থাকায় পরিবেশজনিত অবক্ষয় বাড়ছে। অতিবৃষ্টির কারণে ভুটানের পাহাড় থেকে ছোট এবং বড় পাথরের টুকরো, নুড়ি পাথর, বালি অতিবৃষ্টি এবং বন্যার জলে প্রবাহিত হয় সমস্ত নদীগুলির খাতে জমে গিয়ে জল বহন ক্ষমতা বছরের পর বছর কমিয়ে দিচ্ছে এবং নদীগুলির অবক্ষয় ক্রমবর্ধমান। তাই ডুয়ার্সে জেলাভিত্তিক অথবা মহকুমা ভিত্তিক বা ব্লক ভিত্তিক সেচ, বন এবং

ভূমির মতো নানা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে যদি ডিজিটাল ডেটা ব্যাংক তৈরিতে যদি ইসরো-র মত সংস্থার সাহায্য মেলে, তবে তা জেলার কাছে আশীর্বাদ হয়েই নেমে আসবে।

যেমন ধরা যাক পাহাড়ের ধ্বস। ভারত সরকার স্বীকৃত জিএসআই এক সমীক্ষা রিপোর্টে দার্জিলিং-এর কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্রকে ধ্বসের দিক থেকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল বা হাই রিস্ক জোন বলে চিহ্নিত করেছে। এগুলি হল পাগলাঝোরা, গিদ্দাপাহাড়, তিনধরিয়া, লিম্বুধারিয়া, মিরিকের সৌরেনি, দারাগাঁও এবং চোদ্দ মাইল। এই অঞ্চলগুলিকে নিয়ে পাহাড়ের ১৭ শতাংশ হাইরিস্ক জোন। প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা বিজ্ঞানী পঙ্কজ জয়সোয়ালের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জেনেছিলাম জিএসআই-এর সমীক্ষায় গুরুত্বের বিচারে দার্জিলিং পাহাড়ের ধ্বসপ্রবণ এলাকাকে চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। এর পরেই প্রয়োজন ওইসব এলাকার বাসিন্দাদের সচেতন করে তোলার ওপর অত্যন্ত নজর দেওয়া। জিএসআই-এর সমীক্ষা অনুযায়ী দার্জিলিং পাহাড়ের ঝুঁকিপূর্ণ এবং মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ ধ্বসপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি সিকিমেরও একটি বড় অংশকে চিহ্নিত করেছে জিএসআই। উল্লেখ্য, কালিম্পং এবং মিরিকের অতি ধ্বসপ্রবণ এলাকায় মাঝেমধ্যেই মৃত্যু এসে অতর্কিতে হানা দেয়। তাই দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক সহ অতি ধ্বসপ্রবণ এলাকার ভূতাত্ত্বিক তথা পরিবেশগত কারণ খুঁজতে আদাজল খেয়ে লেগেছে জিএসআই।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মতে, দার্জিলিং এবং লাগোয়া এলাকার গড় বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পেলে ধ্বসের প্রকৃত কারণ জানা যাবে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং ধরন নিয়ে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর সবসময় ঠিকঠাক তথ্য দিতে পারে না। বৃষ্টি বাদলা সম্পর্কে তাদের পূর্বাভাসও সময় সময় মেলে না। কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণকে ধ্বসের কারণ অনুসন্ধানে তুরুপের তাস বলে মনে করছে ভারতের ভূতত্ত্ব গবেষণা বিভাগ। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর ভারতের সর্বত্র রেইনগেজ বা বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র এখনো বসাতে পারেনি। পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকার ফলে তাদের কাছে বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত নিখুঁত তথ্য থাকে না। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং এবং শিলিগুড়িতে তারা রেইনগেজ বসাতে পারলেও অন্য জায়গাগুলিতে পরিকাঠামোর অভাবে সেটা করা সম্ভব হয়নি। বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টি মাপার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকার ফলে আবহাওয়া দপ্তরের কাছ থেকে এই ব্যাপারে বিশেষ কিছুই তথ্য মেলে না। কিন্তু টি এস্টেটগুলি তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই রেইন গেজ রাখে। প্রতিদিন পাহাড়ি এলাকার কোথায় কী পরিমাণ বৃষ্টিপাত হচ্ছে তার বিস্তারিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পাওয়া যায় চা বাগিচাগুলি থেকে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে ভূপ্রকৃতি, ভূমির উচ্চতা, ভূমির চরিত্র সম্পর্কিত ৩৫ রকমের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই তথ্যমালা থেকেই ধ্বসের কারণ এবং তার প্রতিকারের উপায় জানা যাবে বলে আশাবাদী জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া।

ইন্ডিয়ান মেটেরিওলজিক্যাল বিভাগের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি যার মাধ্যমে সঠিক স্থান বা সময় এবং মাত্রা অনুসারে ভূমিকম্পের আগাম পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। ফলে এই পরিস্থিতিতে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি এবং জীবনহানিরোধে উপযুক্ত ভূকম্প প্রতিরোধক ঘরবাড়ি নির্মাণের ওপর জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। কোন বহুতল ইমারত যত বেশি উঁচু হবে তার রিস্ক ফ্যাক্টর ততটাই বেশি। তাই একটি বিল্ডিংএর সঠিক ডিজাইন, লেআউট, রিইনফোর্সমেন্ট, ঘরের সংখ্যা, দরজা-জানালার সঠিক অনুপাত, বজায় রাখা জরুরি। ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড এর রিপোর্ট অনুযায়ী গোটা ভারতবর্ষে খুব কম বিল্ডিংই রয়েছে যার যথাযথ ভূমিকম্প প্রতিরোধক ডিজাইন যাকে বলা হয় ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ক্রাইটেরিয়া ফর আর্থকোয়েক রেজিস্ট্যান্স ডিজাইন সেটা মেনে করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান মেটেরিওলজিক্যাল বিভাগের ওয়েবসাইটে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ভূকম্পপ্রবণ অঞ্চল বা সিসমিক জোনের মানচিত্র অনুসারে ভারতবর্ষের পাঁচটি সিসমিক জোনের পঞ্চম নম্বর জোন ভেরি হাই ড্যামেজ রিস্ক জোন। এই এলাকার মধ্যে পড়ছে ভারতের কাশ্মীর উপত্যকা, পশ্চিম এবং মধ্য হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, উত্তর বিহার, কচ্ছ এবং সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারত। ৪ নম্বর সিসমিক জোনে অর্থাৎ হাই ড্যামেজ রিস্ক জোনে রয়েছে গাঙ্গেয় উপত্যকা, দিল্লি, উত্তর বিহার সংলগ্ন ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী এলাকা এবং উত্তরবঙ্গ। তাই বলা যায়, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার উচ্চ ভূকম্পপ্রবণ এলাকা। সাম্প্রতিককালে ঘটা ভূমিকম্পে যেভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরের বাড়িঘরে ফাটল ধরেছে বা ভেঙে পড়েছে তাতে বহুতল ইমারত তৈরি করতে গেলে যথেষ্ট সতর্কতা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কেনা এই সকল ফ্ল্যাটবাড়ি ভূমিকম্পের সময় কতটা নিরাপদ? আদৌ ভূমিকম্প প্রতিরোধক ব্যবস্থা মেনে এই সমস্ত বহুতল ইমারত গড়ে উঠছে কিনা সেই নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্নচিহ্ন আছে। বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। দূর্বল পার্টিশন দিয়ে অনেকক্ষেত্রে শ্রেণীঘরগুলিকে ভাগ করার চেষ্টা করা হয়। এটা বিপদজনক। ভূমিকম্পে সিঁড়ির ক্ষতি হওয়ার প্রবণতা থাকে। তাই প্রয়োজন বিকল্প সিঁড়ির যা অনেক সময়ই থাকে না।

পূর্ব হিমালয়ের একাধিক তুষার হ্রদ উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিপদজনক। কারণ পাহাড়ের বহু উঁচু এলাকায় অবস্থিত এই হ্রদগুলির জলস্তর অদূর ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গ এমনকি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বিপদের কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা। ভুটানের উত্তরাঞ্চলে আছে অজস্র হিমবাহ এবং তুষার হ্রদ।

ভূমিকম্প এবং ধ্বসপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত দার্জিলিং পাহাড়। পাহাড়ে যেভাবে বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছে এবং গাছ কাটা হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতের বিপদের ইঙ্গিত বারেবারেই দেওয়া হয়। পুর আইন এবং নিয়ম অনুযায়ী পাহাড়ে তিনতলার বেশি বাড়ি তৈরি করা বেআইনি কাজ। কিন্তু নিয়মকে তোয়াক্কা না করে বহুতল তৈরি হচ্ছে সেখানে। পাহাড়ে এই মুহূর্তে ১১.০৫ মিটারের বেশি উচ্চতার বাড়ি করার নিয়ম নেই। বেশ কিছু বাড়ির মালিককে চিঠি পাঠিয়ে বেআইনিভাবে নির্মিত বাড়ির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে পুরসভা বিক্ষিপ্তভাবে ব্যবস্থা নিলেও বহুকাল ধরেই বেআইনি নির্মাণ চলে আসছে দার্জিলিং পাহাড়ে। ফলে ভূমিকম্প বা মেঘভাঙ্গা বর্ষণে কোনওরূপ বিপর্যয় ঘটলে তার জন্য দায়ী থাকবে নিয়ম বহির্ভূতভাবে গড়ে ওঠা বিল্ডিং।

পূর্ব হিমালয়ের একাধিক তুষার হ্রদ উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিপদজনক। কারণ পাহাড়ের বহু উঁচু এলাকায় অবস্থিত এই হ্রদগুলির জলস্তর অদূর ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গ এমনকি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বিপদের কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা। ভুটানের উত্তরাঞ্চলে আছে অজস্র হিমবাহ এবং তুষার হ্রদ। সমীক্ষায় দেখা গেছে ভুটানে রয়েছে ৬৭৭টা হিমবাহ এবং ২৬৭৪টা তুষার হ্রদ। হ্রদ ফেটে বিধ্বংসী বন্যার সম্ভাবনার দিক থেকে বিপদজনক হ্রদের সংখ্যা ৮২টি। বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে পাহাড়ি এলাকায় হিমবাহ গলে যাওয়ার হার বাড়ছে প্রতিনিয়ত।

পিলিন, লহর, সুনামি, আয়লা, হুদহুদের তাণ্ডবে বারে বারে বিপর্যস্ত উপকূলীয় অঞ্চল। সাম্প্রতিককালে ফণীর ফণায় তছনছ হয়ে গেছে উড়িষ্যা এবং অন্ধ্র উপকূলীয় অঞ্চল। যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে অবস্থা সামাল দেওয়া গেছে। আবহাওয়া দপ্তর সঠিক সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দেওয়াতে এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া গেছে। ইসরো তার স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকারের আবহাওয়া বিভাগ কে ফণীর সম্ভাব্য রুট সম্পর্কে আগাম সর্তকতা বাণী প্রদান করেছে। তার ফলেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। ১০ লক্ষ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া গেছে প্রশাসনিক সহযোগিতায়। অতএব উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগকে ব্যবহার করে ইসরোর সহযোগিতায় যদি এই ধরনের প্রযুক্তি গড়ে ওঠে তাহলে উত্তরবঙ্গের মাটিতে বন্যা, ভূমিকম্প এবং নদীভাঙ্গন প্রতিরোধে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। কারণ এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং ভূমিকম্পের আশঙ্কায় কিন্তু ভীতসন্ত্রস্ত সিকিম, উত্তরপূর্ব ভারত, ভুটানসহ আমাদের রাজ্যের উত্তর অংশের সচেতন মানুষ। কিন্তু সচেতনতা এখনও প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। মিটিং মিছিল বা সেমিনার না করে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে আমাদের চিন্তাভাবনা করার সময়কাল এসেছে যে এই উদাসীনতা কাটিয়ে বা সরকারি পয়সা খরচ করে এই সচেতনতা প্রকল্প আর কতদিন চালিয়ে যাবে সরকার? মানুষকে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার জন্য এবার মনে হয় প্রকৃতিকে নিয়ে খেলা করার বিরুদ্ধে কঠোর আইন জারি করার সময়কাল এসেছে।

উত্তরে সেদিনের সেনাপতিরা

পীযুষকান্তি মুখার্জি সংগ্রাম ও রাজনীতির দুঃসাহসী সেনা

দেবব্রত চাকী

কাকাবাবু এসেছেন আলিপুরদুয়ারে। রাত্রিবাস তাঁর সুহৃদ নীলকান্ত মুখার্জির বাড়িতে। দীর্ঘদিনের পরিচয়, প্রথম সাক্ষাৎ রাজসাহীতে। তা স্বভাবতই রাজনীতির মানুষ যখন মুখার্জি বাড়িতেই এসেছেন তখন সেখানে রাজনীতির কথা হওয়াই কাম্য। বিভিন্ন রাজনীতির আলোচনায় রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন নীলকান্ত মুখার্জির কণিষ্ঠ ভ্রাতা পীযুষকান্তি মুখার্জি। শুরু হল রাজনীতির পথচলা। অবশ্য সে পথ কাকাবাবু অর্থাৎ প্রবাদপ্রতিম কম্যুনিস্ট নেতা মুজাফফর আহমেদের পথ নয়; সে পথ জাতীয় কংগ্রেসের পথ। এই পথ ধরেই তিনি হয়ে উঠলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সেনানী। পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতা পীযুষ মুখার্জি।

রাজনীতির প্রতি আগ্রহ জন্মানোর পর মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে তিনি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। গান্ধীজির আদর্শে ছাত্রাবস্থা থেকেই কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী হিসাবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। আলিপুরদুয়ার হাইস্কুল থেকে ১৯৩২ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। এর পরবর্তীতে ১৯৩৪ সালে আই.এস.সি. পাশ করে মোক্তারি পড়তে শুরু করেন এবং ১৯৩৭ সালে মোক্তারি পাঠ সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে রংপুরে কারমাইকেল কলেজে বি.এস.সি. পঠনপাঠন শুরু করলেও রাজনীতি তাঁর পঠনপাঠনে হয়ে দাঁড়ায় অন্তরায়। ১৯৩৮ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে আলিপুরদুয়ার মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে হয় পীযুষ মুখার্জিকে। অতঃপর শুধু রাজনীতি আর রাজনীতি।

১৯৩৯ সাল, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ি শহরে। সম্মেলনের সভাপতি শরৎচন্দ্র বসু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হলেন সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আলিপুরদুয়ার থেকে বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলনে যোগদান করেন পীযুষ মুখার্জি। সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বানে আপোষহীন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে পীযুষ মুখার্জি ডুয়ার্স জুড়ে ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেন। ওই বছরই তিনি আনন্দবাজার ও হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার স্থানীয় সংবাদাদাতা নিযুক্ত হন। এর ফলে তার জনসংযোগের মাত্রা অনেকাংশেই বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে জোরদার করতে পীযুষ মুখার্জি আলিপুরদুয়ারের এডওয়ার্ড লাইব্রেরিকে বেছে নেন। সেখানে তরুণ প্রজন্মকে

৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলনে ডাইরেক্ট অ্যাকশানের দিন আলিপুরদুয়ার মহকুমায় ধার্য হয়েছিল ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ তারিখে। এই পর্বে পীযুষ মুখার্জির ওপর দায়িত্ব বর্তায় কালচিনি থানা এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করবার, সঙ্গী দত্ত সিং সন্ন্যাসী মূল দায়িত্বে এবং পীযুষবাবু সহযোগী। কেননা তাঁকে কুমারগ্রামে আন্দোলন সংগঠিত করবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়। যদিও সশস্ত্র সংগ্রাম সফলকাম হয়নি। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন পীযুষ মুখার্জি।

সদস্য করানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন আলোচনা সভা, বিতর্ক সভা আয়োজন ইত্যাদি কর্মকান্ড তরুণদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তাঁর উদ্যোগে এবং জগন্নাথ বিশ্বাস, আমেদ হোসেন, সুনীল ভৌমিক, সন্তোষ ভট্টাচার্য, শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সহযোগিতায় ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয় হাতে লেখা পত্রিকা 'আলোক'। ১৯৪২ সালে পীযুষ মুখার্জির নেতৃত্বে এডওয়ার্ড লাইব্রেরির পরিচালন সমিতির নির্বাচনে কংগ্রেসিরা জয়লাভ করে। পরিচালন সমিতির সভাপতি হন মণীশ রায় এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন পীযুষ মুখার্জি। এই সময়কালে গ্রন্থাগার আন্দোলন আলিপুরদুয়ার মহকুমা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। একে একে গড়ে ওঠে গান্ধি পাঠাগার (কামাখ্যাগুড়ি), সুভাষ পাঠাগার (দত্তপট্টি), প্রগতি পাঠাগার (বাবুপাড়া), তরুণ পাঠাগার (চাপরের পার), সুভাষ পাঠাগার (জটেশ্বর) ও জাগৃতি পাঠাগার (বাবুপাড়া)। অর্থাৎ গ্রন্থাগার স্থাপনের মধ্যে দিয়ে তরুণ প্রজন্মকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা ও এর মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রসার ঘটানোই ছিল মূল লক্ষ্য— তা বলবার অবকাশ থাকে না। পীযুষ মুখার্জি এক্ষেত্রে দক্ষ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

যেমন করে তাঁকে আমরা দেখতে পাই ৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলনের পটভূমিতে আলিপুরদুয়ার মহকুমার বুকে। ৯ই অগাস্ট ১৯৪২, মহাত্মা গান্ধি আহ্বান জানালেন 'ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো'। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ভারতছাড়ো আন্দোলন। আলিপুরদুয়ার মহকুমাও সুর মেলালো ৪২-এর বজ্রনির্ঘোষে। অর্থ সংগ্রহ শুরু হল গ্রাম-শহর সর্বত্র। সংগৃহীত অর্থ কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কংগ্রেস নেতা বিজয় সিং নাহারকে প্রদান করলেন পীযুষ মুখার্জি। এর সঙ্গে সঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ণের স্ত্রী প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে দেখা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে ফিরে এলেন। ফরওয়ার্ডব্লক পন্থী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা এবং গোপন বৈঠকের মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা নেন পীযুষ মুখার্জি। সর্বভারতীয় স্তরে যোগাযোগ গড়ে ওঠে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন, রামমনোহর লোহিয়া, অরুণাআসফ আলী প্রমুখের সঙ্গে। মহকুমা কমিটির সম্পাদক হিসাবে মহকুমায় সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি অগ্রণী সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অর্থ সংগ্রহ করে কলকাতায় গিয়ে বিজয় সিং নাহারের মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে গোপনে আলিপুরদুয়ারে নিয়ে এসে তা নরেন দাগার পাটের গুদামে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখাসহ দুঃসাহসী বিভিন্ন কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন পীযুষবাবু। এই সকল কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে পীযুষ মুখার্জি ক্রমশ কংগ্রেস নেতা বিজয় সিং নাহারের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। যাইহোক ৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলনে ডাইরেক্ট অ্যাকশানের দিন আলিপুরদুয়ার

মহকুমায় ধার্য হয়েছিল ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ তারিখে। লক্ষ্য থানা, পোস্ট অফিস, রেল স্টেশন ধ্বংস করার লক্ষ্যে অগ্নিসংযোগ, রেল লাইল উপরে ফেলা, টেলিগ্রাফের তার কেটে ফেলা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পর্বে পীযুষ মুখার্জির ওপর দায়িত্ব বর্তায় কালচিনি থানা এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করবার, সঙ্গী দত্ত সিং সন্ন্যাসী মূল দায়িত্বে এবং পীযুষবাবু সহযোগী। কেননা তাঁকে কুমারগ্রামে আন্দোলন সংগঠিত করবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়। যদিও সশস্ত্র সংগ্রাম সফলকাম হয়নি। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন পীযুষ মুখার্জি। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে আলিপুরদুয়ার মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মনোনীত হন পীযুষ মুখার্জি।

উত্তর স্বাধীনতা পর্বে পীযুষকান্তি মুখার্জি সক্রিয় আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করার পাশাপাশি জেলা বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৫০ সালে জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডে গঠনকালে মোট ১২ জন সদস্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পীযুষ মুখার্জি। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন। ১৯৬৭ ও ১৯৭১ সালে (অন্তরবর্তী নির্বাচন) তিনি কুমারগ্রাম বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন পীযুষকান্তি মুখার্জি। যদিও পরের বছরে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে কংগ্রেস দলের প্রার্থীপদ থেকে বঞ্চিত করা হয়। তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে কুমারগ্রাম কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উদ্যোগী হলে সেই সময়কার তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব সর্বশ্রী বরেণ ভৌমিক, দেবপ্রসাদ রায়, অস্তি বিশ্বাস, নিত্যগোপাল মজুমদার প্রমুখ তাঁকে তা থেকে বিরত করেন। পরবর্তীকালে রাজ্য কংগ্রেস নেতা বিজয় সিং নাহারের সঙ্গে তিনি কংগ্রেস দল ত্যাগ করেন। স্বাধীনোত্তর কংগ্রেস রাজনীতিতে তিনি বিজয় সিং নাহারের অনুগামী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ১৯১৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি ভূমিষ্ঠ হওয়া রমণীকান্ত মুখোপাধ্যায় ও শরৎকুমারী দেবীর সন্তান পীযুষ মুখার্জি ১৯৯৮ সালের ৫ই জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই নির্ভীক সেনানীকে আলিপুরদুয়ারবাসীর কাছে ভাস্বর করে রাখতে ২০১৫ সালে আলিপুরদুয়ারের তৎকালীন বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায় সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় (Corpus fund-এর ২০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা করা সহ) সোনাপুরে স্থাপন করেন 'পীযুষকান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয়'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই কলেজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি (৫ একর) বরাদ্দ করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উদারতার পরিচয় রেখেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। পীযুষ মুখার্জির জন্মশতবর্ষে এইটিই ছিল বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায়ের উদ্যোগে তাঁর প্রতি আলিপুরদুয়ারবাসীর শ্রেষ্ঠার্ঘ্য। ইতিহাস তো সে কথাই বলবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
সুধীর রঞ্জন ঘোষ, উমেশ শর্মা ও দেবপ্রসাদ রায়।

(আগামী সংখ্যায় । **ডুয়ার্সের গান্ধী যজ্ঞেশ্বর রায়**)

উত্তরের উপকথা

লোক পুরাণের গল্প

এই ডুয়ার্সেরই এক ধানখেতের অস্থায়ী চালাঘরে সেদিন টিমটিমে প্রদীপ, হিমের পরশ মাখা প্রচ্ছদে তকতকে নিকোনো ঘরবাড়িতে লতা ফুল ধানছড়ার আঁকিবুঁকি, বাঁশবাগানের গা ঘেঁসে ঘনিয়ে ওঠা অঘ্রাণের সন্ধেয় আরও সুন্দর হয়ে উঠছিল লোকপুরাণের আবহ। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে চর্চিত দেবকাহিনির নামই তো লোকপুরাণ, যাকে পোশাকি ভাষায় বলে মিথ। মিথে নাকি মিথ্যাই বেশি, হলোই বা। গল্পের টানে যাঁরা সেগুলি শুনবেন, একেবারে খালি হাতে ফিরবেন না কিন্তু। লোকপুরাণের ঝুলিতে বিশ্বসৃষ্টি, মহাজগত, দেবতার উদ্ভব, মানুষ ও অন্যান্য জীবের সৃষ্টি সংস্কৃতি, মাটি জল আগুন বাতাস আকাশের খুঁটিনাটি কী আছে আর কী নেই। ফারাক একটাই, শাস্ত্রমন্ত্রের ফাঁদে পণ্ডিতের টিপ্পনীতে সে হাঁসফাঁস হাঁফায়। তার মুক্তি আলোয় ধুলায় জলে ঘাসে আকাশে আর মানুষের চর্চায়।

সেদিন যেই না প্রান্তবাসীটি ঝাঁপি খুললেন, তাঁর নিপুণ কথকতায় কালিকাপুরাণ থেকে উঠে এলেন শিব চন্ডী ইন্দ্র আকাশগঙ্গা। জন্ম হল কার্তিক ঠাকুরের। নাগবিথীস্থিত ছয় কৃত্তিকা নক্ষত্র শিশুটিকে স্তন দিলেন, কার্তিকের নাম হল ষড়ানন...

শুনতে শুনতে পুরো কাহিনি শেষ হলে ভাবছিলাম, সভ্য সজ্জিত শহুরে সুন্দরী ডুয়ার্সের সঞ্চয় থেকে কত সহজে হারিয়ে গেছে এইসব গল্প, নজরেই পড়েনি কারোর। মিথ হয়তো মিথ্যা। কিন্তু প্রবাদ অবশ্যই সত্যি, মানুষই দেবতা গড়ে।

কাহিনিটি এইরকম— কার্তিক এখন ভরা জোয়ান। একদিন শিব তাকে ডেকে বললেন, শোন বাপ। বড় হয়েছিস, এইবার ঘরে বউ আন। বালাবতী কন্যাকে আমি পছন্দ করেছি। তোর তাকে বিয়ে করতে হবে। তবে সেটা যেন তেন কাজ নয়। গোদাদেও সাগরের তলে সাতালি পাহাড়, তার ভিতরে আছে হরির কমন্ডলু, কমন্ডলুতে আছে কন্যা। তাকে বের করে আনতে হবে। আর দেখিস, তোর মা যেন এসব জানতে না পারে। তাহলে ঘেঁটি ধরে তোকে কোনও দেবকন্যার সঙ্গে বিয়েয় বসিয়ে দেবে। ভেবেচিন্তে এগোস।

পিত্তি জ্বলে গেল কার্তিকের। বাপটা যে শুধু গাঁজা খায় তাই নয়, বুড়ো বয়সে বউয়ের ভয়ও ধরেছে। বলি, মেয়ে দেখেছো, বিয়ে করব। এতে ভাবনার কী? আরে আমিও কি যেমন তেমন? ছত্রিশ বাণ আছে, অমন ময়ূরবাহন আছে, তিনভুবনের সেরা বীর দেবসেনাপতি কাউকে ডরায় নাকি?

যেমন বলা তেমন কাজ। কার্তিক সোজা গোদাদেও সাগরের পাড়ে গিয়ে ঝাঁক ঝাঁক তীর মেরে সাতালি পাহাড় ফাটিয়ে বের করে ফেলল হরির কমন্ডলু। বাঁ হাতে সেটি ধরে ডান হাতের পাতায় উপুড় করতেই বেরিয়ে এলো চোখ ধাঁধানো রূপসী বালাবতী। রূপোর বালুকণার চিকমিক তার সর্বাঙ্গে, গায়ে সাগরের ঘ্রাণ।

কার্তিক বলল, আজ তোমাকে উদ্ধার করে রেখে গেলাম। কাল কৈলাস থেকে সাজন বাজন নিয়ে এসে তোমায় বিয়ে করে নিয়ে যাব। আজকের দিনটা অপেক্ষা করো।

বালাবতী সুশীলা। অখন্ড ধৈর্য নিয়ে বসে রইল সাগরপাড়ে। মনে মনে আশা, অমন রূপবান পুরুষটি বিয়ের শ্রী-আংটি, নোলক, রূপোর গোটছড়া নিয়ে আসবে।

ওদিকে কার্তিক ঘরে ফিরে বিয়ের তত্ব, বরযাত্রী, মিতর-সোদর জোগার করে পরদিন রওনা হলো। মাঝপথে এসে দেখে, এই যাঃ। ছুরিকাটারি তো আনতে ভুলে গেছি। নারদদাদা, জলদি যাও সেটি নিয়ে এসো। বিয়ের পাত্র পাছঘাটা ধরতে পারে না।

নারদ শিবালয়ে গিয়ে দেখে কার্তিকের মা চন্ডী নেয়ে ধুয়ে ভাত চড়িয়েছে। ঝাল মরিচ তুলেছে ভাতে মেখে খাবে বলে। নারদের মনে হল, একটু গোল পাকিয়ে দিলে কেমন হয়। নিরীহ মুখে চন্ডীকে বলল, আজই খেয়ে নাও মামী, আর ভাত জুটবে না তোমার।

চন্ডীর শ্যামা ললাটে ভাঁজ পড়ল, কেন? ভাতে কী দোষ হল?

ওমা, জানোনা? তোমার কাত্তিক বিয়ে করতে গেছে। বউ মহা সুন্দরী। সে তোমায় ভাত দেবে? এই আমি ছুরিকাটারি নিয়ে চললাম, ভাইবৌ নিয়ে ফিরব।

রাগলে সে রণচন্ডী! আকাশ পাতাল এক করে হুঙ্কার ছেড়ে ভাতের হাড়ি নিয়ে বসল চন্ডী। গোগ্রাসে গিলছে কাঁসি কাঁসি ভাত। শিখর-দশনে কাঁচামরিচ চিবোচ্ছে কচকচ।

চমৎকার হয়েছে! মহানন্দে নারদ দৌড়ে গেল কার্তিকের কাছে। ভয়ার্ত ভঙ্গিতে বলল ভাইরে! বিয়ে করতে যাস না। ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করছিস শুনে চন্ডীমামী রাজ্য গিলতে বসেছে।

বিয়ে মাথায়। ফেরতা পথে বাড়ি গিয়ে কার্তিক দেখে গোটা ভাতের হাঁড়িখানা গলায় উপুর করেছে মা চন্ডী। এখুনি একে না থামালেই নয়।

এক মোক্ষম তীর ছুঁড়ে মা কে মেরেই ফেলল কার্তিক।

শিব হায় হায় করে উঠলেন, কী করলি বাপ! মা কে হত্যা করলি? আমাকেই বা রাখলি কেন, মেরে ফেল।

ভারি অনুতাপ হল কার্তিকের। অস্ত্র ফেলে নিরামিষ্য ঘাটে গিয়ে ধর্মঠাকুরের কাছে কেঁদে পড়ল। বড়ই অধর্ম হয়ে গেছে, ক্ষমা দাও।

ধর্মর অজানা কিছুই নেই। তিনি কার্তিককে নিদান দিলেন, ওই যে মুন্ডু দিয়ে গাঁথা মালা পড়ে আছে, ওটি মায়ের গলায় পরিয়ে দাও গে, মা বেচেঁ উঠবে।

মায়ের প্রাণ ফিরিয়ে কার্তিক গেল গোদাদেওয়ের পাড়ে। কেউ কোথাও নেই। বরের পথ চেয়ে চেয়ে বালাবতীকন্যা সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে।

মন ভেঙে গেল কার্তিকের। বালাবতী, তুমি শঙ্খ হয়ে সমুদ্রে থেকো। এয়োরা তোমায় কেটে হাতে পরবে। ওই হাতে আমাকে বরণ করবে, আমি তোমায় দেখব। আর বিয়ে করব না।

কার্তিক হয়ে রইল আইবুড়ো আর বালাবাতী হয়ে রইল শাঁখের মুড়ো।

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

নদীতে মাছের অভাবে বিপন্ন বংশানুক্রমিক পেশা মাছচাষে সাবেক মৎসজীবিদের উৎসাহ বাড়ছে কি?

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

তিস্তার চরে বাস করে বেশ কিছু পরিবার। ভীষণ লড়াকু মনের মানুষগুলো। হারান দাস, কালাচান দাস আর মানিক দাসের সঙ্গে অনেকটা সময় কথা বলেছিলাম। প্রথমে ওরা যথেষ্ট সংশয়ে ছিল, আমাকে নিয়ে। পরে বেশ ভাব হয়ে গেল। ওরা এককালে পূর্ব পাকিস্থানের ময়মনসিং জেলায় বাস করত। মানিকের বর্তমান বয়স বাহান্ন তার জন্ম জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে। মানিক কিছুটা পড়াশুনো করেছে। তবে এদেশে জন্ম হয়েও তার কথায় ময়মনসিং জেলার টান। এন.আর.সি-র খবরও রাখে। ওর বাপ, ঠাকুরদা সবাই 'জাউলা' (জেলে) মানে মৎসজীবি। মাছ ধরাই ওদের বংশানুক্রমিক জীবিকা ছিল। সেই দেশেও নিজেদের পুকুর ছিল না। পরিবারের পুরুষরা সবাই নাকি নদীতে, খালে বিলে মাঝ ধরে বেড়াত। দেশটাই ছিল তাদের নদী নালা আর খাল বিলের। জাল ফেললে মাছ উঠবেই। হারানদের নাকি বেশ কিছুটা জমি জিরেত ছিল। কালাচান বা মানিকদের ভিটে সংলগ্ন জমি ছাড়া কৃষি জমি ওই দেশেও তেমন কিছু ছিল না।

হারান এগার বছর বয়সে এদেশে এসেছিল, এখন তার বয়স তিয়াত্তর বছর। তখন তিস্তা শহরের পাশ দিয়েই বইত। তিস্তার চরে হোগলা আর কাশ বনের গভীরে ডোরাকাটা বড় বাঘ থাকত। সে নাকি বাঘের ডাক নিজের কানেই শুনেছে। এদেশে তখন অনাবাদি প্রচুর জায়গা জমিন। আর আশ্চর্য হয়ে দেখেছিল, চিনেছিল এক রূপালি মাছকে। নাম তার বোরলি। দু তিন ঘন্টা নদীর ধার দিয়ে ধর্ম জাল নিয়ে ঘুরে বেড়ালেই একদেড় সের মাছ ধরা যেত। মাছ ধরাটাই ওদের পৈতৃক জীবিকা। হারান আরও বলেছিল, "এই সব নদীর চর সব দখল হয়ে গেল। আমরা তখন শাক সবজি আবাদ শুরু করলাম। মাছ ধরাও চলছিল। তবে তিস্তার বোরলি কিন্তু গত ত্রিশ বছরে একদম শেষ হয়ে গেল। পঞ্চাশ বাহান্ন বা তার বেশি বছর হয়ে গেল আর কোনওদিন বাঘের ডাক শুনিনি"।

এখনও তিস্তা, করলা, মহানন্দায় মাঝেমাঝেই মরা মাছ ভেসে আসে। বিষ প্রয়োগ করে এমন এমন পাপ ঘটানো হয়। হারান দুঃখের সাথে জানিয়েছিল "গত ত্রিশ বছর, কোনওদিন আর আমি আগের মত দু-তিন ঘন্টায় এক-দেড় কিলো বোরলি মাছ মারতে পারিনি"। জানতে চেয়েছিলাম কৃষিজমিতে, ছোট নালা গুলোতে এখন আর মাছ কেন পাওয়া যায় না? উত্তর মিলেছে, "পাপ পাপের জন্যি এই দশা। জমিতে বিষ দিলে মাছ কি আর বাঁচবে?" চরের বাসিন্দা লোকদের স্থানীয়রা চরুয়া বলে। হারানের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কার্ড আছে, প্রতিমাসে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেনসনের হাজার টাকা ঢোকার কথা। টাকা আসে তবে নিয়মিত প্রতি মাসে নয়। ২০০৯ সালে শহরে তিন কাঠা জমি কিনেছে। ছোট একটা বাড়ি হয়েছে সরকারি প্রকল্পে। নাতি নাতনিদের পড়াশোনার জন্য বাড়িটা দরকার ছিল। এই উদ্বাস্তুদের অনেকেই এখন সম্পন্ন গৃহস্থ। হারানবাবু এই বয়সেও মাছ ধরেন। তবে পরের প্রজন্মের কেউ আর রাতের অন্ধকারে হাতে টর্চ নিয়ে বোয়াল শিকারে যায় না। ওদের জীবিকা পাল্টে গেছে। কালাচানেরও এদেশে আসার বাষট্টি বছর হল। সে মাছ ধরে না, বিক্রি করে দাঁতের মাজন।

আসলে সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদনের জন্য যা কিছু দরকার যেমন চারা পোনা, মাছের খাবার ও ওষুধপত্র পাওয়া যায়। পুকুর তৈরি করবার সময় চুন, মহুয়া খইল, মাছের খাদ্য সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করলে খরচ অনেকটাই কম লাগতেও পারে। নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ এক সাথে গোবরসার খরিদ করলেও কিছু অর্থ সাশ্রয় হতে পারে, এটাই সমবায় আন্দোলনের মূল কথা। তাছাড়া সরকারের বদান্যতায় মাছ ধরার জাল, হাঁড়ি, দাড়িপাল্লা, বাটখারা ইত্যাদি কখনও কখনও মৎসজীবিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে কোচবিহার জেলায় অনেক জলাশয় আছে, সেসব জায়গায় মৎস চাষ প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। দিনহাটার দুটি ব্লকে ও কোচবিহার ১ নং ব্লকে উন্নত প্রযুক্তিতে মৎস চাষ দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত আছে। দিনহাটায় বেশ বড় আকারের জলাশয়ে এক সময় সমবায়ের ভিত্তিতে মাছ চাষ হত। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় একসময় বেশ কিছু 'মৎস চাষী সমবায়' গড়ে উঠেছিল। জলপাইগুড়ি জেলায় এখনও প্রতিটি ব্লকে একটি করে প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং জেলায় কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি অবস্থান করছে। জেলা মৎস দপ্তরের কার্য্যালয়ের নিচের তলায় সি.এফ.সি.এস (সেন্ট্রাল ফিসারমেনস কো-অপারেটিভ সোসাইটি) র দপ্তর। ওখানে দেখা হয়েছিল রতন কুমার দাস মহাশয়ের সঙ্গে। ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহানি এলাকার বাসিন্দা, উনি সি.এফ.সি.এস-এর সেক্রেটারি। ওদের আরেক সহকর্মী রঞ্জিত বর্মনের সঙ্গেও ওখানেই সাক্ষাৎ। জানতে চাইলাম, "এই দপ্তর থেকে মৎস চাষীরা বা সমবায়ের সদস্যরা কী কী সুযোগ সুবিধা পেতে পারে?"। প্রথমে তাঁদের কথা শুনে মনে হল সদস্যরা কোনওরকম সুযোগসুবিধাই বোধহয় পায় না। পরে বুঝলাম মৎসজীবিদের সঙ্গে কমিউনিকেশনে এঁদের যথেষ্ট আড়ষ্টতা রয়েছে। তবে ধীরে ধীরে সুতো খুলছিল। জানা গেল, আসলে সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদনের জন্য যা কিছু দরকার যেমন চারা পোনা, মাছের খাবার ও ওষুধপত্র পাওয়া যায়। পুকুর তৈরি করবার সময় চুন, মহুয়া খইল, মাছের খাদ্য সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করলে খরচ অনেকটাই কম লাগতেও পারে। নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ এক সাথে গোবরসার খরিদ করলেও কিছু অর্থ সাশ্রয় হতে পারে, এটাই সমবায় আন্দোলনের মূল কথা। তাছাড়া সরকারের

বদান্যতায় মাছ ধরার জাল, হাঁড়ি, দাড়িপাল্লা, বাটখারা ইত্যাদি কখনও কখনও মৎসজীবিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

মৎসজীবিদের অনেকেই মাছ ধরার জাল তৈরি করেন। তবে শুধু জাল তৈরি কারও জীবিকা হতে পারে না। একটা 'ফেকা জাল' তৈরি করতে মোটামুটি তিন মাস সময় লেগেই যায়। সুতো লাগে ২ কেজি থেকে ২.৫ কেজি, জালের কাঠি (লোহা নির্মিত) লাগে ৪কেজি থেকে ৫ কেজি। তা ছাড়া ঘেরা জাল, খেপলা জাল, ফাঁসি জাল, ধর্ম জাল সহ নানাপ্রকারের জাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আসলে উত্তরবঙ্গে সব নদীতে বারো মাস জাল ফেলে মাছ ধরার মত জলের গভীরতা থাকে না। যে কারণে প্রাচীনকাল থেকেই বাঁশ দিয়ে তৈরি নানা প্রকার ফাঁদ ব্যবহার করা হত, এখনও হয়। এছাড়াও কোঁচা বা ট্যাটা, একটা ৫-৬ ফুট লম্বা বাঁশের মাথায় একটা লোহার শলাকা বসানো থাকে। একটু বড় শোল, শাল, মাগুর জাতীয় মাছ রাতের বেলায় টর্চ জ্বেলে সন্ধান করা হয় এবং তাক করে কোঁচা বা ট্যাটা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়। এছাড়া উত্তরবঙ্গের মানুষজন মাছ ধরার জন্য বাঁশের তৈরি ঝোঁকা, ট্যামাই, টেপাই, ধরকা, জোলংগা, ডেরু, হ্যাঙ্গা প্রভৃতি নানা প্রকার দেশজ ফাঁদ ব্যবহার করত। মাছ বা মাছ মারার এইসব উপকরণ উত্তরবঙ্গের প্রাণের গান ভাওয়াইয়াতেও স্থান করে নিয়েছে ক্ষ্ম "ও মোর চ্যাংড়া বন্ধুরে, হ্যাঙ্গা দিয়া মোক মাছ মারিয়া দে।"

কোচবিহারে নানারকম মাছ স্থানীয় জলাশয়ে ও নদীতে পাওয়া যায় এখনও। তবে তা পরিমাণে যথেষ্ট কম এবং দামও আকাশছোঁয়া। সবচেয়ে মহার্ঘ তোর্সার বোরলি মাছ। চার ইঞ্চি সাইজের বোরলি স্বাদে গন্ধে অনবদ্য। তাছাড়া পাবদা, চাপিলা, বাটা, সরপুঁটি, মৌরলা প্রচুর পাওয়া যেত। স্থানীয় রুই কাতলা ছাড়া ধুবড়ি থেকেও আসত বড় মাছ, তার স্বাদ ভোলা যায় না। একসময় কোচবিহারের গোপাল কেবিনের খুব নামডাক ছিল। ওদের রুই বা কাতলের কালিয়া, মুড়িঘন্ট, হালকা সরষে দিয়ে বোরলি মাছের ঝোল সত্যিই মনে রাখার মত রেসিপি ছিল। কোথায় গেল সে সব দিন? তবে দারিকা, পুঁটি, ঘুতুম, ট্যাংরা, খলিসা, মাগুর, শিঙ্গি মাছ বর্ষার শেষে শরতের শুরুতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কলার খোলা মুড়িয়ে সেই মাছ বাজারে বিক্রি হত।

প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গ দেশে মৎস উৎপাদনে প্রথম পুরস্কার পেয়ে আসছে। তবু আমরা মাছ ও ডিমের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশের ভরসায় কেন? জেনেছিলাম মৎস উৎপাদনে নয়, আমাদের রাজ্য প্রথমস্থান অধিকার করে আসছে মাছের বীজ (চারা পোনা) উৎপাদনে। সেগুলো নাকি রাজ্যের বাইরে লালন পালন করে টেবল সাইজ বানিয়ে আবার আমাদের রাজ্যেই ফিরে আসছে।

মৎসজীবিদের নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক মৎসচাষের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। সে প্রশিক্ষণ অবশ্যই হতে হবে পুকুর পাড়ে, ক্লাস ঘরে নয়। সঠিক প্রার্থী বাছাই করাটাকে গুরুত্ব দিতে হবে। যার বাড়িতে একটা ডোবাও নেই তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কী লাভ? আর বিনে পয়সায় প্রশিক্ষণ হবে না। সমতল মাটিকে কেটে পুকুর তৈরিতে প্রচুর পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়। মাত্র এক বিঘের একটা সমতল ভূমিকে এক মিটার খনন করতে প্রায়

মৎসজীবিদের নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক মৎসচাষের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। সে প্রশিক্ষণ অবশ্যই হতে হবে পুকুর পাড়ে, ক্লাস ঘরে নয়। সঠিক প্রার্থী বাছাই করাটাকে গুরুত্ব দিতে হবে। যার বাড়িতে একটা ডোবাও নেই তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কী লাভ? আর বিনে পয়সায় প্রশিক্ষণ হবে না।

৫০০০০ টাকা খরচ করতে হয়। আর এক মিটার খনন করে সারা বছর সব জায়গাতে জল থাকবে না। যেহেতু ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন হবে তাই নতুন করে পুকুর খনন করলে অবশ্যই 'ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর' এর অনুমোদন প্রয়োজন হবে, হ্যাপা কম হবে না।

পুকুরে মাছ না থাকলে বা জল খুব কম থাকলে প্রতি বিঘার জন্য ২৫ কেজি থেকে ৩০ কেজি চুন দিতে হবে। পরবর্তীতে প্রতি মাসে বিঘা প্রতি ৫ কেজি করে চুন দিয়ে যেতে হবে। শুরুতে মহুয়ার খইল প্রয়োগ করে পুকুরকে শুদ্ধ করে নিতে হয়। এর ফলে ছোট মাছ খেয়ে ফেলে এমন সব মাছ মরে যায় এবং পুকুরের উর্বরতা বাড়ায়। বিঘা প্রতি একশো কেজি প্রয়োগ করলে ফল পাওয়া যাবে। এর ফলে জলে দু রকম খাদ্য তৈরি হয় 'ফাইটো প্লাঙ্কটন' ও 'জু প্লাঙ্কটন'। বর্তমানে এক বিঘার পুকুরে উন্নত প্রথায় মৎস চাষে (১ মিটার খনন সহ) প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। নাবার্ডের অনুমোদিত(২০১৭-১৮) নিম্নে বর্নিত চারটি স্কিমে ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া যায়:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের বিবরণ	আয়তন	প্রকল্প ব্যয় টা.	পরিশোধের সময়
১.	তৈরি পুকুরে মাছ চাষ	১ হেক্টর	৩০৪০০০	৫ বছর
২	০.৩ মিটার খনন ও চাষ	১ হেক্টর	৪৩৩৮০০	৫ বছর
৩.	০.৬ মি. খনন ও চাষ	১ হেক্টর	৪৪৩৮০০	৫ বছর
৪.	১.০ মি. খনন ও চাষ	১ হেক্টর	৬২৯৬০০	৫ বছর
৫.	চিংড়ির চাষ	১ হেক্টর	২০০০০০	৫ বছর

প্রতিবিঘা জমিতে এক হাজার থেকে দেড় হাজার ৫-৬ ইঞ্চি সাইজের মাছের চারা ফেলতে হয়। কাতলা, রুই ও মৃগেলের অনুপাত হয় ২ঃ৩ঃ৩ সাথে বাটা মাছের চারা অথবা পুকুরে পাঁক থাকলে মাগুর মাছ ছাড়া যায়। দ্রুত বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প এবং সাইপ্রেনাস কার্প একই অনুপাতে অল্প পরিমাণে ছাড়া যেতে পারে। মাছের খাবারের পরিমাণে কোনও রকম আপোষ করা চলবে না। জলে বেশি মাছ থালে শুধু খাবার নিয়ে সমস্যা হবে তা নয়, অক্সিজেনের সমস্যাও হতে পারে। তখন পাম্প চালিয়ে বাইরের জল ফোয়ারার মত পুকুরে ফেলতে হয়।

অনেকে মূলধনের সমস্যা মেটানর জন্য প্রথমেই তিন-চার হাজার চারা পুকুরে ছাড়ে। দেড় মাস পরেই ছোট মাছ কিছুটা তুলে বিক্রি করে দেয়, আবার দেড় মাস পরে আরও কিছু মাছ তুলে বিক্রি করে। এ ভাবেই অনেকে কার্যকরী মূলধনের সমস্যা মেটায়।

ব্যাঙ্ক ঋণ কৃষকের একটা বড় সমস্যা। আসলে ব্যাঙ্ক ঋণ পেতে হলে কতগুলি প্রাথমিক নিয়ম কানুন মানতে হয়। জমির কাগজপত্র যেন পরিস্কার থাকে, সমতল জমি চলবে না। চুন, মাছের চারা, মহুয়া খইল, মাছের খাদ্য ইত্যাদির সরবরাহ যেন লাগাতার চলতে থাকে। কৃষকরা যেন জলাশয়ের বীমা করতে সম্মত থাকেন। যদিও মাছ বিক্রি আমাদের রাজ্যে কখনও কোন সমস্যার কারণ হবে না তবুও ব্যাঙ্ক কিন্তু সম্ভাব্য বাজারের ব্যাপারটা বুঝেই ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রকল্পের কাগজপত্রে এবং আর্থিক হিসাবপত্রে ফিশারি এক্সটেনশন অফিসারের ভেটিং বা অনুমোদন লাগবে। এসব ঠিক থাকলে ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।

মাছের খাদ্য থেকে ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়া সবটাই কৃত্রিম বা ল্যাবরেটরি জাত। এই মাছ বাঙ্গালীর রসনাকে কতদিন তৃপ্তি দেবে এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। আর ইলিশ এখন তিস্তার কতটা পানি বাংলাদেশে যাবে সেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। তবু আমরা চাই জেলেরা তাদের লুপ্তপ্রায় পেশায় ফিরুন, এ রাজ্যে মাছ কেনাবেচার বাজার বাড়ুক, অন্য রাজ্যের রাসায়নিক যুক্ত মাছ আসা কমুক, নতুন প্রজন্ম মৎসচাষে কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পাক। নদীর বিবাগী মৎসজীবিদের জলাশয়ে ফেরাতে গেলে প্রয়োজন সরকারি উৎসাহ প্রদান ও ঋণের সহজতম প্রক্রিয়া। না হলে উত্তর বাংলার নগরমুখী জীবন চর্চা থেকে 'মৎস মারিব খাইব সুখে' প্রবচনটি বিলুপ্ত হতে আর দেরি নেই।

কবির কলমে

এইসব খড়কুটো

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

বর্ষামুখর শ্রাবণ সন্ধ্যায় বইয়ের তাকের ধুলো ঝাড়তে বসে হঠাৎ কুড়ি বছর আগের এক রঙিন মলাট উলটে গেলে উড়ে এল একটা লজেন্সের র‍্যাপার! পরিষ্কার করে ভাঁজ করে রাখা হালকা গোলাপি সেই মোড়কে কিরকম স্ট্রবেরি গন্ধ আবছা হয়ে লেগে আছে এখনও। কিছু মনে পড়া কিছু না-পড়ার ভিতর তখন হাতে ধরা বইটি গৌণ হয়ে পিছন ফিরে হাঁটা দিল মন আর এলোমেলো চিন্তাস্রোত! —আচ্ছা এই যে অকারণ জিনিসপত্র, অপ্রয়োজনীয় টুকরো টাকরা এরকম যত্নে লুকিয়ে থাকে জীবনের আনাচকানাচে— যাকে বলে "জমিয়ে রাখা", তা কি আমাদের সকলেরই কম-বেশি ঘটে না জীবনে কখনও না কখনও? মৌসুমী ভৌমিকের সেই গান— "কিছু ফেলতে পারি না" বেজে ওঠে কোথায় যেন। বৈষয়িক জমাখরচের হিসেবের জমজমাট যাপনের বাইরে যে মানুষ আলগোছে বা উদাসীনতায় বেঁচে নেয় নিজস্ব জীবন— সেখানেও আসলে বহু কিছু নিজের অলক্ষ্যে জমিয়ে তুলতে থাকে সে। এই জমার কোনও হিসেবও থাকে না সবসময়। এমনকি স্মৃতিতেও মাঝেমধ্যে থাকে না এসব জমে থাকা বস্তুর হিসেব। কিন্তু থেকে যায় তারা। অনেক সকাল দুপুর বিকেলের গন্ধ নিয়েই থাকে। কখনও পুরনো কোনও বাতিল ব্যাগের ভিতর হলুদ সুতো রাখিবন্ধনের আভাস নিয়ে। কখনও কোনও ভুলে যাওয়া মানুষের হাতের লেখার চিরকুট। কখনও নিমন্ত্রণপত্র কোনও— হয়ত বড্ড আন্তরিকতা ছিল লেখার হরফে— তাই জমিয়ে রাখা ছিল সযত্নে। মনে আছে, সদ্য বিয়ের পর বাপের বাড়ি থেকে আনা এক ট্রাংক ভর্তি এরকম আবোলতাবোল জিনিসপত্র গোছাতে বসেছিল এক মেয়ে। কী নেই তাতে? আপাতভাবে বাতিল প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে অজস্র স্মৃতিগন্ধ মাখা শৈশব, কৈশোর আর সদ্য যৌবনে পা রাখা দিনগুলোকেই বন্দি করতে চেয়েছিল হয়ত সেদিন সে। খুব প্রিয় একটা পাইলট পেন মেরুন রঙের শরীরে সোনালি মুকুটের মত ঢাকনা। এটা বাবা ব্যবহার করতেন। মাধ্যমিকে একশ জনের মধ্যে নাম থাকায় তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। একটা লাল মলাট ছেঁড়া ডায়েরি। সেই ক্লাশ ফাইভ থেকে হিজিবিজি লেখার। তার ভিতরে আবার স্কুলের সরস্বতী পুজোর কার্ড যার ছড়াটা নিজের লেখা। দু-একটা কৃষ্ণচূড়ার শুকনো পাঁপড়ি। কৈশোরের কাটাগোল্লা খেলার উষ্ণতা মাখামাখি তাতে। মা দুর্গার হাতের অপরাজিতা। দেশের বাড়ির সন্ধিপুজো শেষে হাতে বেঁধে মায়ের আশিস অপরাজিত থাকো আজীবন। স্মৃতিতে চলকে ওঠা ঢাকের বাদ্যি তক্ষুণি। অজস্র চিঠিপত্র— কত বিখ্যাত ব্যক্তির হাতের লেখা, কত পুরনো বন্ধুর ঝগড়া অভিমানের টুকরো, ইউনিভার্সিটিতে হস্টেলে থাকাকালীন মায়ের লেখা লাইন টানা খাতায় লম্বা লম্বা চিঠি...

বাতিল জিনিস জমাতে জমাতে আজকাল ফেলতে শিখেছিও অনেক কিছু। এই যেমন নিজের প্রকাশিত কোনও লেখার কাগজ জমানো নেই। কিচ্ছুটি না। যদি না সে কাগজ বা পত্রিকা অন্য লেখাদের জন্য রাখতে ইচ্ছে হয়। নিজের ছাপানো লেখা জমালে ভাললাগা বইপত্রের স্থান-সংকুলান কীভাবেই বা হবে! সুতরাং এ বিষয়ে উদাসীন হওয়া অভ্যেস করা গেছে বহুকাল।

তখন এক উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ে হেডমিস্ট্রেস মা স্কুলে বসে সারা সপ্তাহ ধরে লিখে যেতেন দূরে থাকা মেয়েকে পাতার পর পাতা। বাবার লেখা ছোট্ট ছোট্ট পোস্টকার্ডে গভীর কত মনিমানিক! অজস্র প্রেমপত্র— কয়েক হাজার, যাদের মালিকের কাছে পাকাপাকি থাকতে এলেও সেগুলোর মায়া বুকে আরও গভীর। আর প্রেম-পর্বের সময়কার অসংখ্য অভিজ্ঞান— যার কোনওটারই না আছে পার্থিব বা বৈষয়িক মূল্য না আছে অখণ্ড আয়ু! অথচ জমিয়ে রাখা চাই। জীবনের প্রথম ঘড়ি নষ্ট হয়ে গেলেও তার বাতিল চামড়ার বেল্ট! খুব বৃষ্টি ছিল সেদিন... বাবার সঙ্গে ঘড়ির দোকানে অনেকক্ষণ আটকে থাকা ছিল লোডশেডিঙে। এইচএমটি ঘড়ির কোম্পানিটাই নেই আর! না-হারানো একখানা নূপুর— অন্যটা অষ্টমীর দুপুরে কোথায় যেন খুলে পড়ে গিয়েছিল! প্রথম শাড়ি পরে বেরোনোর দিন ছিল না সেটা? নবম শ্রেণি কি? শাড়িটা হলুদ নাকি কমলা? কপালের টিপ সেঁটে বানানো বুকমার্ক কৃষ্ণনগরের এক পত্রবন্ধু— যে মেয়েকে কখনও দেখিইনি জীবনে, পাঠিয়েছিল! চা-ফুলের ছিন্ন পাঁপড়ি— খুব ভোরে শিবমন্দির থেকে সেই নকশালবাড়ি অবধি পায়ে হেঁটে গিয়ে তুলে এনে দিয়েছিলে! ঠিকানা লেখা খাম চিঠিটা নেই, মানুষটাও। হাতের স্পর্শটুকু থাক! থেকে যায় পুরনো প্রিয় চশমার ভাঙা হাতল, বিএড ক্লাশে মেয়েদের দেওয়া হাতে আঁকা ছবি, জামার বোতাম, বাতিল পার্স, তুলে রাখা লাল সাইকেলের চাবি, কুড়োনো ঝিনুক, মাছরাঙার পালক, পাহাড়ি ঝোরার ছোট্ট নুড়ি, গন্ধহীন খয়েরি হয়ে যাওয়া কাঠগোলাপ! এইসব বাতিল জিনিস গোছাতে গিয়ে মেয়ে ভুলে যায় ব্যাংকের পাসবই, সার্টিফিকেটের ফাইল, জরুরি চাবির গোছা, না-ভাঙানো চেক! ইউনিভার্সিটির তুমুল প্রেম-পর্বের এক দিনের গল্পে এরকমই কিছু মহার্ঘ প্রাপ্তির গল্প এই ফাঁকে করে নেওয়া যায়। রোদ ঝলমলে এক শীতের দুপুরে একটা বেশ বড় হলুদ প্রজাপতিকে ডানা ভেঙে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে দেখে মেয়েটির যখন কাঁদোকাঁদো দশা— তাকে

উদ্ধার করে ছেলেটি তুলে দিয়েছিল হাতে। সেই মৃত পতঙ্গের ঠাঁই হয় এক কাঞ্চন ফুলের পাতার বিছানায় আর সেদিন থেকে সে পায় অত্যাশ্চর্য উপহারের সম্মান! ব্যস— আর যায় কোথায়? মহানন্দা তিস্তা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে বেশ কয়েক বছর পর তাদের সংসারী জীবনে তখন এক বাসাবদলের হুড়হুড়ি চলছে। সেদিনের মেয়েটি, কয়েক বছরের গিন্নীপনা সেরে নিজেকে বেশ গোছানো বলেই মনে করে। ট্রাকে মালপত্র তোলা হয়েছে। নতুন কেনা ফ্ল্যাটবাড়িতে ট্রাক যাচ্ছে খাট আলমারি সংসার মাথায়। শাশুড়িমা জানতে চাইলেন— হ্যাঁ, রে— দরকারি জিনিসপত্র হাতব্যাগে রেখেছিস তো? একগাল হাসি দিয়ে গিন্নি সম্মতি জানালে তার ব্যাগ থেকে বেরলো গুচ্ছের চিঠি, চার বছরের পুত্রের প্রথম দুধের দাঁত আর সেই মৃত প্রজাপতিভরা বাক্স। —আর গয়নার বাক্স? সেটা কোথায়? —কেন? আলমারিতেই! ট্রাকে চেপে এতক্ষণ নতুন ফ্ল্যাটে!

তো এরকমই বাতিল জিনিস জমাতে জমাতে আজকাল ফেলতে শিখেছিও অনেক কিছু। এই যেমন নিজের প্রকাশিত কোনও লেখার কাগজ জমানো নেই। কিচ্ছুটি না। যদি না সে কাগজ বা পত্রিকা অন্য লেখাদের জন্য রাখতে ইচ্ছে হয়। নিজের ছাপানো লেখা জমালে ভাললাগা বইপত্রের স্থান-সংকুলান কীভাবেই বা হবে! সুতরাং এ বিষয়ে উদাসীন হওয়া অভ্যেস করা গেছে বহুকাল।

যা বলছিলাম— এই অভ্যেসে অনভ্যেসে জমিয়ে রাখার ব্যাপারটি মোটেই আমার একচেটিয়া বলে দাবি করতে রাজি নই বা এ যদি দোষের হয়, সে দোষের ভাগীদার হতেও। খুব গোছানো মানুষ যিনি তিনি হয়ত সযত্নে অবসর গ্রহণের সময়ও ক্লাশ ওয়ানের মার্কশীট জমিয়ে রেখেছেন। সেসব যদি অকাজের হয়েও জমানো যায়— স্মৃতির খাতিরে, তবে প্রজাপতির পাখনা কী দোষ করল বাপু? বিভিন্ন রসিদপত্র, আয়-ব্যয়ের হিসেব নিকেশ জমিয়ে রাখা মানুষজনকে সম্ভ্রমের চোখে দেখি খুব। মহাকাশ-বিজ্ঞানী বা অমর্ত্য সেন-কে সামনে থেকে দেখার মত শ্রদ্ধা আর বিস্ময় নিয়েই দেখি। নিজের অক্ষমতার লজ্জা লুকিয়েই দেখি। বারবার ভুল হয়ে যায় মূল্যবান আর অমূল্যের হিসেব নিকেশে। ভূ মধ্যসাগরের সাদা নুড়িটির পাশেই শুইয়ে রাখি নায়াগ্রার ঝকঝকে নীল অজানা পাথরের টুকরো। প্রিয়জনেরা সাগরপার থেকে উপহার আনতে চাওয়ায় এগুলোই চেয়ে নেওয়া। মেপল পাতার পাশেই শুয়ে থাকে শুকনো আঙুরলতাও। অনেক গল্প ওদের সঙ্গে একার আমার। "পাতাকুড়োনি" অভিধা গর্বের সঙ্গে মাথায় লটকে সেদিনের সেই মেয়ে মাঝবয়সেও জমিয়ে যাচ্ছে অকারণের খড়কুটো। জমিয়ে যাচ্ছে মায়া আর মুহূর্তের অমরত্ব! অল্প শুকিয়ে আসা যে ঝাউপাতারা সবসময়ের সঙ্গী পার্সের ভিতর ঘুমের ভান করে শুয়ে আছে, শুধু তারাই জানে এই জমিয়ে রাখা আছে বলেই তার মনখারাপের ব্যাগের ভিতর মেঘবন্দি করে রাখার ম্যাজিক দিয়ে যেকোনও সাদা কালো দিনকেই সে নিমেষে লাল-নীল-সবুজের সমারোহ এনে দিতে পারে! থাক জমে— কারণ অকারণের ভাললাগা আর বিষণ্ণতার মত এইসব নিতান্ত অদরকারীর তালিকা। যখন জীবন নিজেই জানে আসলে কিছুই তার সঙ্গে নেওয়ার নয়, তখন প্রয়োজনের শর্তে নাই-ই বা বাঁধা পড়ল কিছু পাগলামো!

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার বই

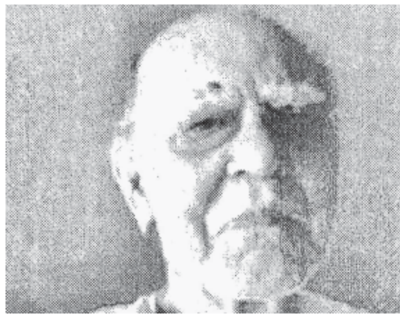

ডুয়ার্স এক বহুবিচিত্র, বর্ণময় ভূখণ্ড। জলপাইগুড়ি জেলা আর আলিপুরদুয়ার জেলার গা লেপ্টে থাকা— 'ছোটখাট মহাদেশ'। বনভূমি, চা-অঞ্চল, হাতি, গন্ডার, বাইসন নিয়ে বহু জাতি-উপজাতি-জন জাতি-ভাষা-ধর্ম-নদ-নদী-পাহাড় নিয়ে যে বহুমাত্রিক জীবন চর্যা, তার মধ্যে বসবাস করে যে কবি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কবিতা লিখেছেন, তাঁকে 'ডুয়ার্সের কবি' বলা যেতেই পারে। হ্যাঁ, তিনি কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ডুয়ার্স এই আঞ্চলিকতাই কিন্তু শেষ কথা নয়। এর বাইরেও সারা বঙ্গে, বহির্বঙ্গেও তিনি বসবাস করেন। আসলে তিনি স্বেচ্ছায় ডুয়ার্সের কবির রাংতার মুকুট পড়ে আমাদের কবিতার ভুবনের রাজাধিরাজ হয়ে উঠতেন।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৯-এ। শৈশব কেটেছে জলপাইগুড়ির মন্ডলঘাটে। পৈতৃক বাসস্থান ছিল বর্ধমানে। জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তখন থেকেই কবিতায় শোরগোল তুলছেন তুষার। এমএ পড়া শেষ করে পাঞ্জাবীর দু' পকেটে সুনীল-শক্তি-তারাপদদের কবিতা নিয়ে ভাসতে ভাসতে জলপাইগুড়ি-ধূপগুড়ি-গয়েরকাটা হয়ে, বীরপাড়ায় এসে থিতু হলেন বাংলার মাস্টার তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতার জন্য নিজের সংসার আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে সম্পর্ক এলমেলো করে দিয়েছেন। 'পদ্য ও মদ্যের' সমীকরণে তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় হতে পারেননি। কিন্তু ডুয়ার্সের নতুন পাতা গজানো বেঁটে চা-গাছ কবিদের মাথার উপর শেড ট্রি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ওর সম্পাদিত 'বনভূমি' পত্রিকা নিয়ে।

আমাদের রাশভারী এক বাংলার অধ্যাপক তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলতেন— 'কবিতা লিখে ওর মত গোল্লায় কেউ যায়নি।' তুষার ঘর কাঁপিয়ে হেসে আবার কবিতাতেই মন দিতেন। দ্রুত লিখতেন এমনতরো লাইন— *"ঘরও গেছে ঘরণী নেই / নদীর কাছে প্রার্থনাহীন—/ পলির কাঁথা মুড়ে ঘুমোয় / ছিন্নস্মৃতির চারণভূমি / সর্বনাশের ধ্বংস ছায়ায় / বেঁচে থাকা যুদ্ধকালীন।"*

কবি ও প্রাবন্ধিক সুব্রত রুদ্র তাঁর বই 'বাংলা কবিতার ষাটের দিনগুলি'তে তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ষাটের অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ষাটের দশকের কবি বলতে সুব্রত রুদ্র বুঝিয়েছেন— 'উনিশশো ষাটের কাছাকাছি সময়ে যাঁরা কবিতা লিখতে এসেছিলেন, ষাটের দশকে যাঁদের কবিতা একটা মোটামুটি আদল পায়।' তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে ষাটের কবি হিসেবে আরো যাঁরা উল্লেখিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন— অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্তী, আনন্দ ঘোষ হাজরা, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, কবিরুল ইসলাম, উত্তম দাস, কার্তিক মোদক, তুলসী মুখোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, যোগব্রত চক্রবর্তী। উত্তরবঙ্গের মঞ্জুলিকা দাস ও সমীর চট্টোপাধ্যায় ও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

সমীর চট্টোপাধ্যায় (কোচবিহার) তাঁর 'উত্তরের চিঠি' কাব্যগ্রন্থে (১৯৯৩) তুষার বন্দ্যোপাধায়কে নিয়ে একটি কবিতায় লেখেন—

দাঁড়াবার জায়গা

(তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়কে)

তাঁর সব কিছুই ছিল / তবুও আজ তাঁকে বড় নিঃস্ব মনে হয় / দেখেছেন তিনি মানুষের ভালবাসা, / মৃত্যুর মহান আয়োজন। / একদিন অগোছালো চুলে হাত বুলোতে বুলোতে / চশমার কাচ মুছতে মুছতে / একটা গাছের দিকে এক মনে তিনি তাকিয়ে রইলেন / একটা গাছ যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে মাটির ওপর / আবার সেভাবে দাঁড়াতে চাইলেন তিনি। /ছন্নছাড়া কবির সংসারে প্রেম প্রতিদিন সজীব হয়ে ওঠে।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার বইগুলি প্রকাশকাল অনুযায়ী— ১) হীরাচুনী-পান্না (১৯৬০), ২) হাঙরের ঢেউ আগুনের সেঁক (সমীর চক্রবর্তীর সঙ্গে যুগ্মভাবে, ১৯৬১), ৩) ঢেউ ওঠে মেকঙে পদ্মায় (১৯৭২), ৪) হাত বাড়ালেই সিংহাসন (১৯৭৭), ৫) উত্তরের কবিতা (সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত সহ, ১৯৭৮), ৬) অললই ঝললই মাদারের ফুল (১৯৭৭), ৭) জড়িয়ে ভয় বেঁচে থাকার, ৮) যুগলবন্দী (যুগ্মভাবে উমা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ, ২০০০), ৯) তিস্তা-তোর্ষায় উজান ভাটি (২০০৬), ১০) ছন্নছাড়ার ছিন্নছড়া (২০০৭)।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ সময় ধরে ডুয়ার্সে বসবাস করেছেন। সমসাময়িক সমাজ জীবনের নানা ওঠাপড়া এসেছে ওর কবিতায়। ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সংরাগ, প্রান্তিক জীবন তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে। রাজবংশী তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষা। 'অললই ঝললই মাদারের ফুল' ও 'তিস্তা তোর্ষার উজান ভাটি' রাজবংশী কবিতার অনবদ্য সংকলন। তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনায়াস সিদ্ধি ছিল ছড়াতেও। 'হীরা-চুনী-পান্না', 'হাত বাড়ালেই সিংহাসন', 'ছন্নছাড়ার ছিন্নছড়া'-তেও বহু মাত্রিক তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনা যায়।

'উত্তরের কবিতা' (১৯৭৮)-র মুখবন্ধে তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন— "আজ থেকে দশ কুড়ি বছরের পর তৎকালীন আধুনিক কোন কবিতার পাঠক হয়ত অসীম আগ্রহে জানতে চাইবেন কবিতার বিবর্তনে একটি ক্ষীণ ছায়াপথের ঠিকানা, শহর দখল করেছেন এমন কোনও কবির পূর্ব পরিচয় যাঁর প্রথম পর্বের রচনা যা একদিন তরাই-ডুয়ার্সের অরণ্যে মহানন্দা-আত্রেয়ী-পুনর্ভবা-তিস্তা-তোর্ষা-কালচিনি-করতোয়ার জলধারায় কত কবির কবিতার সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছিল, পাথুরে মাটির গন্ধ বুকে নিয়ে কবিতাকে ভালবেসে যাঁরা একদিন পথের দু'পাশে ছড়িয়ে ছিলেন তাঁদের অতীত ইতিহাস। তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা এই ইতিহাসেরই পৌনঃপুনিক পাঠ।"

রণজিৎ কুমার মিত্র

চেনেন কি ডাঙ্গী এরোড্রাম?

‘সাইলিমাইলি’র মাঝে এক বিশাল সবুজ প্রান্তর! বাম হাতে রহিমাবাদ ও ডান দিকে জয়ন্তী চা-বাগান। জয়ন্তী চা-বাগিচার বুক চিরে সবুজ গালিচা বিছানো চারশো মিটার পথ পাড়ি দিলেই সুন্দরী জয়ন্তী পাহাড়ের কোলে এক সুবিশাল সবুজ প্রান্তর! পাশ দিয়ে কুল কুল করে বয়ে চলেছে তুরতুরি নদী। প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যে চোখ জুড়িয়ে যাবেই যাবে। প্রায় ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্যের সবুজকে কাঁটাতারের বেস্টনীতে ঘিরে রেখেছেন সীমা সুরক্ষা বল। না এটা কোনও নিছক মাঠ নয়। প্রাথমিক ভ্রম হলেও হতে পারে! জয়ন্তী ও ফাঁসখাওয়া— যমজ পাহাড়, স্থানীয় ভাষায় ‘সাইলিমাইলি’র (সেজবোন-মেজবোন) মাঝে একফালি সবুজ মাঠ। এই একফালি সবুজ প্রান্তর দেড়শ বছরের ইতিহাস বহন করে চলেছে ডুয়ার্স ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ রাজ বিস্তারের। সবুজ ঘাসের আস্তরণের নিচেই কংক্রিট। লুকিয়ে মান্ধাতার আমলে তৈরি এক আস্ত এরোড্রাম! বৃটিশ আমলা ও বণিকদের ব্যবহারের জন্য ‘ডাঙ্গী এরোড্রাম’। আলিপুরদুয়ারের চা-বাগিচার গোড়াপত্তন এই এরোড্রাম হবার পরেই। প্রথম চা-বাগান ‘রংপুর টি এস্টেট’। আজ একে বলা হয় ‘মাঝেরডাবরি টি এস্টেট’। তবে বাগানের অফিসিয়াল কাগজপত্রে কিন্তু ‘রংপুর টি এস্টেট’র ব্যবহারই আছে আজও। এরকম ৯টি চা-বাগান সাহেবরা গড়ে তোলেন এই এয়ারস্ট্রিপকে ব্যবহার করে। সবগুলিই আজও বর্তমান। যেমন তুরতরি চা বাগান, রহিমাবাদ চা বাগান, কোহিনূর চা বাগান, ধরণীপুর চা বাগান, কার্তিকা চা বাগান উল্লেখ্য।

সাল ১৮৬৫। দীর্ঘ লড়াই শেষে ব্রিটিশরা ভুটানের সঙ্গে ‘সিণুলা চুক্তি’ করে। সম্পূর্ণ ডুয়ার্স ব্রিটিশের অধীনে আসে। ময়নাগুড়ি থেকে ব্রিটিশ হেড কোয়ার্টার সরিয়ে আনা হয় বক্সাতে। অনুমান এই সময়ই গড়ে তোলা হয় এই এরোড্রাম। সে সময় বক্সা বাঘবনের জঙ্গল ছিল আরও ঘন। হিংস্র পশুর অবাধ বিচরণভূমি। তাই সাধারণ কর্মীবর্গ ও লেবার শ্রেণি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়ত করলেও ব্রিটিশ আমলারা সে ভাবে যেতে যাবেন কেন! অগত্যা পাহাড়ের কোলে জঙ্গল কেটে গড়ে ওঠে ‘ডাঙ্গী এরোড্রাম’। চার সিটের ছোট্ট প্লেন ওঠা নামার এয়ার স্ট্রিপ। শুধু ব্রিটিশ আমলারাই নন, সওয়ার হতেন চা-বাগিচা করতে আসা বণিকরাও। এরোড্রাম ঘেঁষেই সাহেবদের জন্য গড়ে ওঠে ‘শেফার্ড লজ’। আজও আছে এই ব্রিটিশ স্থাপত্য। শুধু মালিকানা পাল্টেছে। পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম এটির মালিক। বহু পর্যটক আসেন প্রতিনিয়ত। ২০০২ সালে ভুটানঘাটের ফরেস্ট বাংলো জঙ্গীরা পুড়িয়ে দিলে, উত্তরের নিরিবিলিতে দিনকয়েক নিরুদ্বেগে কাটিয়ে যেতে ভিভিআইপি-দের মন ভাল রাখার পহেলা নম্বর ঠিকানা কিন্তু এই এরোড্রামের ‘শেফার্ড লজ’ই!

“উত্তরবঙ্গের প্রথম এরোড্রাম এই ‘ডাঙ্গী এরোড্রাম’। কিন্তু এর ওপর কোনও ফোকাস নেই।

পর্যটকরা প্রায় জানেনই না। এর পুরো ইতিহাস আজও ধোঁয়াশাতে। সেভাবে কোনও লেখালেখিও কোনওদিন হয়নি। পর্যটন দফতরের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।” বেশ ক্ষোভের সঙ্গে জানান এই এলাকায় দীর্ঘদিন কাজ করে চলা উত্তরের পরিবেশ আন্দোলনে যুক্ত ‘ন্যাস গ্রুপ’এর কর্ণধার অরূপ গুহ। আলিপুরদুয়ার চৌপথি থেকে ১৮ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে সলসলাবাড়ি। এখান থেকে ১০ কিলোমিটার ডুয়ার্স এর প্রাচীন এলাকা শামুকতলা। মাঝে পড়বে মহাকালগুড়ি, টোটোপাড়া, যশডাঙ্গা। এর পরবর্তী ১৩ কিমি পথ মনোরম চা-বাগান আর জঙ্গল পথ। কোহিনূর চা বাগান, রহিমাবাদ চা বাগান, তুরতুরি চা বাগান, ধরণীপুর চা বাগান, জয়ন্তী চা বাগান পেরিয়েই এই ঐতিহাসিক এরোড্রাম।

ইংরেজ সাহেবদের কাছ থেকে দুটি বাগান কিনে নিয়েছিলেন হায়দরাবাদের বনেদী ব্যবসায়ী ইকবাল আহমেদ। দুই মেয়ে রহিমা ও কোহিনূরকে নিয়ে বাগানেই থাকতেন। দুই বোনের রূপের ছটা আজও এলাকার পুরনো মানুষ সুহেল মুণ্ডা, শিবু গোয়ালারা মনে রেখেছেন। ইকবাল সাহেবের নিজস্ব প্লেন ছিল। ছোট মেয়ে কোহিনূর অজানা রোগে মারা যায়। দুই মেয়ের নামে দুই বাগানের নামকরণ করে বাগান বিক্রি করে ডুয়ার্স ছাড়েন ইকবাল আহমেদ। ডাঙ্গী এরোড্রাম থেকেই তাঁর ছোট প্লেন শেষবারের মত হায়দরাবাদে উড়ে যায়।

মূলত চা-বাগান গড়ে তোলা এবং ডুয়ার্সকে কেন্দ্র করে ভুটান ও অসমে বা উত্তর-পূর্ব ভারতে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেই ব্রিটিশরা গড়ে তুলেছিল বক্সা বাঘ বনের গভীরে ‘ডাঙ্গী এরোড্রাম’। কেননা বক্সাই তখন ব্রিটিশদের হেড কোয়ার্টার। “১৯৬৫ সালে তহশিল ও ১৯৭০ সালে ৩ বছরের জন্য মহকুমা হয় বক্সা। ব্যস্ততম জায়গা। তৈরি হচ্ছিল রাস্তা, অফিস, স্টাফ কোয়ার্টার। আনা হয় ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর মালভূম এলাকা থেকে পাহাড়-জঙ্গল কেটে বসতি গড়ার জন্য সাঁওতাল ও মদেশীয়দের। নেপাল থেকে আসে বহু নেপালি। এরাই সব গড়ে তোলে। অনেকেই আর না ফিরে থেকে গেছে এখানেই।” জানালেন আলিপুরদুয়ারের প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক রমেন দে।

১৯০০ সাল। রেল চালু হল আলিপুরদুয়ারে। বামনহাট স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে আলিপুরদুয়ার হয়ে রাজাভাতখাওয়া স্টেশন। সেখান থেকে জয়ন্তী ও বক্সা স্টেশন। ট্রেন বয়ে নিয়ে যায় মানুষের পাশাপাশি পাথরও। গড়ে ওঠে পাকা রাস্তা। ফলে ব্যয়বহুল এই ছোট্ট এয়ারস্ট্রিপ গুরুত্ব হারায়। সিভিল এভিয়েশন ডিপার্টমেন্টও আপত্তি জানায়। ফলে ১৯৪৪ সালে বন্ধ হয়ে যায় ‘ডাঙ্গী এরোড্রাম’। সেই থেকে পরিত্যক্ত। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশের শরণার্থীরা দখল করে থাকে এই এলাকা। কিছুদিন পর তারাও চলে যায়। ১৯৮০ সালে অসমের বাঙালি শরণার্থীরা বেশ জাঁকিয়ে বসে এখানে। সে সময় এর পরিচয় হয় ‘ডাঙ্গী ক্যাম্প’ বলে। কয়েকমাস পরে ক্যাম্প উঠে গেলেও এরোড্রামের এলাকায় বসতি বা ছোটো কলোনি গড়ে রয়ে গেছেন অনেকেই। এখন এসএসবি ঘেরাটোপে আছে মূল এরোড্রামটি।

ডুয়ার্সের বনজঙ্গল চষে বেড়ানো মানুষ প্রকৃতিপ্রেমী কোচবিহারের মহারাজার এ ডি সি পূর্নানন্দ রায়ের নাতি আশিস রায়, ‘ন্যাস গ্রুপে’র সম্পাদক অরূপ গুহ, উত্তরবঙ্গের প্রবীণ সাংবাদিক রমেন দে, আলিপুরদুয়ারের শিক্ষক ভাস্কর মজুমদাররা কিন্তু অনেকদিনই সরব হয়েছেন কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার, আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের অন্তর্গত বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই ডাঙ্গী এরোড্রামকে নিয়ে। এর আরও প্রচার ও ভাল সংরক্ষণ চান ওঁরা। ‘সাইলিমাইলি’র মাঝে যমজ পাহাড় জয়ন্তী ও ফাঁসখাওয়ার আড়ালে মুখ লুকিয়ে থাকা ‘ডাঙ্গী এরোড্রাম’এর কথা কয়জন জানেন? রাতের পাহাড় জঙ্গলে নিস্তব্ধতা নামে। অদূরের আদিবাসী বস্তিতে তখন মাদলের তাল থেমে গেছে। চির শান্ত হয়ে পড়ে আছে ‘ডাঙ্গী এরোড্রাম’। সেই কবে শেষ পাইলট উড়িয়ে নিয়ে গেছে তার হাওয়াই জাহাজ! আজ কাঁটাতার ভেদ করে একটি শিশুও খেলতে আসে না তার বুকে!

দিব্যেন্দু ভৌমিক

ছবি: প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

তবু বর্ষা এলেই মনে পড়ে জয়ন্তীর কথা

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

আলিপুরদুয়ার কোর্ট স্টেশনের পাশ দিয়ে ঘাঘরা, রাখালের মাঠ, গরম, ডিমা নদী, রামধনু আঁকা নীলাকাশ, এবরোখেবরো পথে পাটকাপাড়া চা-বাগান। দেখে মনে হয় রুগ্ন, ক্ষীণ, রুক্ষ্ম তেমনই চা-পাতি কারখানা। লাগোয়া জঙ্গল লোপাট হচ্ছে প্রতিদিন। শালবল্লা সাইকেলে চাপিয়ে প্রকাশ্যে কাঠ চোরেরা নিয়ে যাচ্ছে। দেখার কেউ নাই, বলার কেউ নাই। গিন্নি বলে— তোমার আগ বাড়িয়ে বলার কি আছে? সাংবাদিকের মত প্রশ্ন করছ কেন? যাচ্ছি ইস্টিকুটুমে। কয়েক বছর আগে মানে বছর পাঁচেক তো হবেই। জানি না বাপী ওরফে সুব্রত কুন্ডু আমাকেই কেন বেছে নিয়েছিল। —'স্যার আপনি যোগ্য ব্যক্তি ইস্টিকুটুম উদ্বোধনের জন্য। পাটকাপাড়া ও নিমতিঝোরার চা-বাগানের মাঝখানে ইস্টিকুটুম। আলিপুরদুয়ার থেকে দমনপুর হয়ে হাইওয়ে ধরে হাসিমারার দিকে যেতে নিমতি দোমহনী। একসময় জাতীয় সড়কের দু'পাশে প্রচুর গাছপালা শোভা পেত। বন্ধু পরিমল তখন নিমতিঝোরা হাইস্কুলের শিক্ষক। ওর কোয়ার্টারের কাছে ছিল অনবদ্য সেগুন বন। হঠাৎ একদিন কাঠচোরেরা সেগুলি চুরি করে নিয়ে গেল। আমি খবর পেলাম পরিমলের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান শুভ্রনীলের কাছে। —'জেঠু তোমার প্রিয় সেগুন বন লোপাট। কাঠ চোরেরা নিয়ে গেছে। এমনকি মাঝে মাঝে চা-বাগানের ছায়া গাছও মাঝে মাঝে কাটা পড়ছে। জনবসতি, ধাবার সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। অনেকে আসা-যাবার পথে ঝাইরাগুড়ির মোড়ে, গরম বিটের পাশে তপনের উন্মুক্ত চায়ের দোকানে একটু জিরিয়ে নেন। আমি একা কিম্বা দোকা মানে গিন্নি থাকলেও একটু বসি। চা, সিঙারা, ঘুঘনি ভালই চলে। শিবুন, বাপী, জ্যোতি, টাটুদের প্রায়শঃ আড্ডা বসে। সন্ধ্যার আগে তপন হান্ডিবর্তন নিয়ে বাড়ি চলে যায় কারণ বুনো হাতির পাল না হলে লেপার্ডদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। সে যাই হোক পুষ্পবৃষ্টি, আদিবাসী নৃত্যগীত, খাওয়াদাওয়ার মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু হয়ে গেল ইস্টিকুটুমের। যাত্রা হল শুরু ৭৫ বিঘা জমির উপর চমৎকার খামারবাড়ি যারা এখনও যাননি তারা অবশ্যই গিয়ে আনন্দ পাবেন। আলিপুরদুয়ার, মেন্দাবাড়ি, চিলাপাতার গায়ে। ইস্টিকুটুম নামকরণ বাপীর মেয়ে লিজার। হলদে পাখি ইস্টিকুটুম আবার কেউ কেউ বলেন বেনে বৌ। শুরু থেকে ইস্টিকুটুমের বিবিধ ফলের গাছে ভর্তি ছিল। আম, জাম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল, তাল, কামরাঙা, বেল, জাম্বুরা। প্রতিবছর ফল-ফুলের গাছ লাগানো হয়। আমার হাতে লাগানো ছোট্ট গোলাপজামুনের গাছ রীতিমতো সাবালক। কালজানি নদীর মুখোমুখি চা-বাগান, জঙ্গলের মাঝেই বলা যায়। রাতে ধুপধাপ তাল পড়ার শব্দে ঘুম ভাঙে। শীতে বাপীর আমন্ত্রণ— স্যার বউদিকে নিয়ে চলে আসুন। খেজুরের রস রেডি। কালো নুনিয়া চালের পায়েস হবে। বছরে অন্তত একবার যাবই। গ্রীষ্মে, বর্ষাতেও গেছি ইস্টিকুটুমে। আমাদের সেবার জন্য যত্ন আত্তির তুলনা নেই। গিন্নিকে বলে, 'চলুন বৌদি আজ নিমতিঝোরার হাটে যাই। ছোট মাছ কিনব, লাউয়ের ডগা। কী খেতে ভাল বাসেন বলুন?' চা-বাগানের হাট পরিক্রমার মধ্যে রোমাঞ্চই আলাদা। বাপীর মতই পরিচয় হয়েছে দীপঙ্করবাবুর সঙ্গে। অরণ্য পাগল মানুষ। অবসরের পর টাকাপয়সা বা পেয়েছেন তা দিয়ে তৈরি করেছেন গাছবাড়ি। দারুণ লোকেশন। সম্মুখে কালজানি। নদীর ওপারে বানিয়া বিট, চিলাপাতা জঙ্গল। অত্যন্ত সাদামাটা শান্ত প্রকৃতির মানুষ। একদিন দুঃখ করে বলেন, দাদা মনে হয় আমার পরিশ্রম সব জলে গেল। আমরা দু'জনে ওনার আতিথ্যে মুগ্ধ। একদিন ছিলাম, রাতে নয় সারাদিন কারণ রাত্রিবেলা নিরাপদ মনে হয় না যদি হাতি এসে নীচে গা চুলকায় তো ধপাস করে ভেঙে

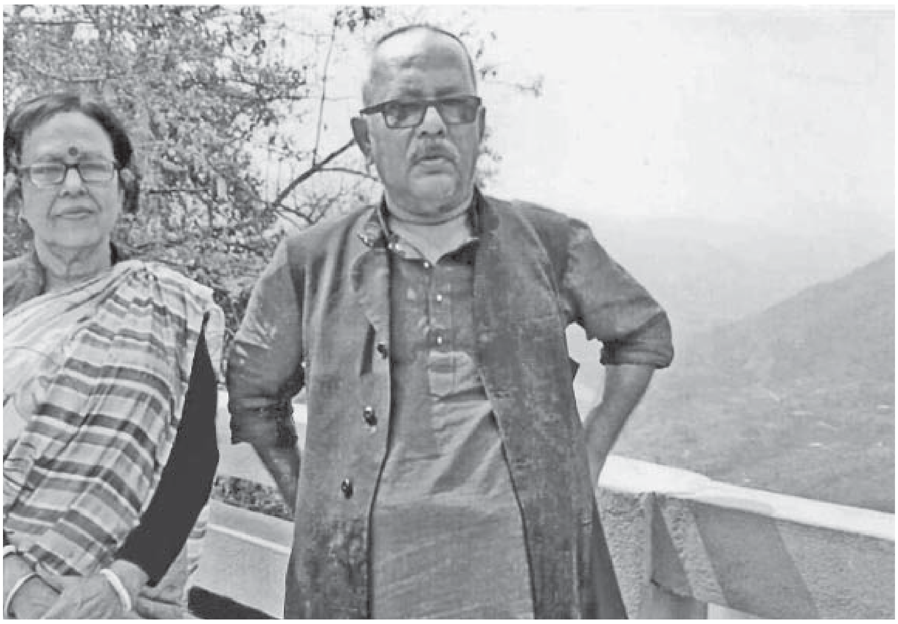

সস্ত্রীক লেখক

পড়বে। দিনের বেলায় কেমন গা ছমছম করে। আমরা গেছিলাম ধান কাটার পর। প্রচুর ময়ূর মাঠে মনের সুখে ধান খুটে খাচ্ছে।

ইস্টিকুটুমে কয়েকটি দিন কাটিয়ে চল যাই রাইমাটাঙের মাধবের বাড়ি। বাপীর গাড়ি কালচিনিতে পৌঁছে দিল সকালবেলাতেই কিন্তু আচমকা হুড়মুড়িয়ে আকাশ কালো করে নামল বৃষ্টি। ড্রাইভার বলে— 'বলেন তো পৌঁছে দিয়ে আসি।' বললাম— মাধবের গাড়ি আসছে, থাক তোমাকে যেতে হবে না। কালচিনি ইস্টিশনে খোঁজ করি শিবুনকে। —'গৌরীদা আপনারা পৌঁছে যান আমি একটু বাদে রওনা করছি। বৃষ্টি কমলে মাধবের লাল রঙের ম্যাজিক গাড়ি হাজির। প্যাসেঞ্জার যদি পাই রাস্তায় তুলে নেব। কোনও আপত্তি নেই তো? কিসের আপত্তি। শান্তিতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো নিয়ে কথা। গিন্নি বলে— কিছু কেনাকাটির দরকার আছে এই যেমন বিস্কুট, চানাচুর, মিষ্টি। কালচিনি রেল লেবেল ক্রশিং। বটতলাতে এলে বুড়োদা মানে গাংগুটিয়ার সনৎদার কথা ভীষণ মনে পড়ে। কাছেই ওনার বোনের বাড়ি যেখানে একবার প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ছিলাম। সস্ত্রীক গেছিলাম কি না মনে করতে পারছি না তবে বানারহাটের সুনীল চক্রবর্তীর ক্ষোভ তিরস্কার, 'কেমন মানুষ হে। বললাম তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।' কথা রেখেছিলাম। রাত্রিতে ছিলাম স্নেহভাজন পার্থদের বাড়িতে। এই দেখুন বেলাইন হয়ে যাচ্ছি রাইমাটাং থেকে বানারহাট। যাইহোক যেতে যেতে মনে পড়ছিল প্রয়াত বন্ধু কাজীমান গোলেকে। সারা জীবনের অর্জিত, সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে তৈরি করেন অসাধারণ ডুয়ার্স সংগ্রহশালা। কালচিনি চা-বাগানের ভিতরে। কালচিনি যানজট, ঘিঞ্জি পরিবেশ পার করে যেতে যেতে দেখি পথের দু'পারে শতবর্ষের বেশি প্রাচীন ঝাপরা কড়ি গাছগুলো মুন্ডুচ্ছেদ। মেচপাড়া, চুয়াপাড়া, ভাটপাড়া, রাধারানী, পার করার পর সেন্ট্রাল ডুয়ার্সর্ন চা-বাগান। আমরা ডান দিকে ঘুরে গেলাম রাধারানী চা-বাগানের ভিতর দিয়ে নদীর বুক বেয়ে এসএসবি ক্যাম্প হয়ে সটান টিলার উপরে। হঠাৎ মনে পড়ল জিগরকে। গাছবাবা। গাছের কোটরে বসবাস করত। যারা রাইমাটাং বেড়াতে যেত অবশ্য দেখতে দোতালা যেখানে সুগত, পিকুরা 'প্রকৃতি নাম দিয়ে পর্যটনের প্রচার ঘটায়। খুবই সাদামাটা বিধিব্যবস্থা যা কি না ছেত্রীবাবুর পরিবার থেকে করা হত। পরবর্তী সময়ে শেখরের অনুরোধে ওঁর শ্বশুর মশাই পশুপতি বাঁড়ুজ্জের বাড়ির একাংশে যার নাম গ্রিন ভিউ লজ। নিজের বাড়ির মত আদরযত্ন। সেই যে পরিচয় এবং জয়ন্তীকে ঘিরে শেখরের যাবতীয় স্বপ্ন যা কিনা ওর মনে সতত উথালপাতাল করে বলার নয়। জয়ন্তীকে সবদিক থেকে রক্ষা করা এবং আলোচনা, কমিটি, যোগাযোগ, গাইডের কাজ সততার সঙ্গে। জয়ন্তীর নাড়ি নক্ষত্র শেখরের মুখস্থ। বৃক্ষ থেকে নদী, জীবজন্তু থেকে পাখি এবং জয়ন্তীর অতীত ইতিহাস। ছোট্ট মাথা গোঁজবার ঠাঁই জয়ন্তী অনেক অনেক বার শেখরের সঙ্গে আমরা দু'জন অরণ্যবিহারে গেছি নদী পেরিয়ে ভুটিয়াবস্তি, চুনিয়া, ফাসখাওয়া হয়ে হাতিপোতা ভুটানঘাট। শেখর সঙ্গে থাকলে সময় দিব্যি পার হয়ে যায়। একবার আমরা দু'জন মিতালিদির চমৎকার হোমস্টে জয়ন্তীবালাতে ছিলাম। সেখানেও জামাই আদরে থাকা। কয়েক বছর হল মিতালিদি চিরতরে চলে গেছে। জয়ন্তী স্কুলের দিদিমণি ছিলেন। এখনও জয়ন্তীর প্রতি আমাদের দু'জনের ভীষণ টান, ভালবাসা। আলিপুরদুয়ার গেলেই গিন্নি বলে— চলো না একবার জয়ন্তী থেকে ঘুরে আসি। জয়ন্তীর প্রতি দুর্বলতা শতবর্ষ আগে হেমেন্দ্রকুমার রায়, পরিমল গোস্বামী, বিভূতিভূষণ, সুনীল গাঙ্গুলি, বুদ্ধদেব গুহ, সাহেবসুবোদের কথা বাদই দিলাম। তবে দুঃখের সঙ্গে নিবেদন করতেই হয় জয়ন্তী আগের মত নেই। কবিবন্ধু কমলেশ তো বড় ক্ষোভ দুঃখে দীর্ঘ কবিতা লিখেছিল— জয়ন্তী আগের মত নাই। বৃদ্ধাশ্রমে চলে গেছে। ভয় হয় আগামী দিনে জয়ন্তী জনপদ থাকবে কিনা। ব্যাঘ্র প্রকল্প হবে কি হবে না বলতে পারব না। জয়ন্তী নদী জয়ন্তী জনপদের চেয়ে উঁচু হয়ে গেছে। কোনওদিন ভাসিয়ে নেবে। তবু বর্ষাকাল এলে জয়ন্তীর কথা মনে হয়। অরণ্য তখন ঘন গাঢ় সবুজ। অসাধারণ।

পুরাণে উপেক্ষিতা এক নারীর দেবী হয়ে ওঠা হল কি?

শাঁওলি দে

একটা সাধারণ মেয়ে কখনও সে নাগরাজ বাসুকির বোন, কখনও বা ঋষি জগৎকারুর পত্নী, কারও কারও কাছে শিবের কিম্বা কাশ্যপ ঋষির কন্যা।

লোকগাথা থেকে সরাসরি পুরাণে চলে যাওয়া কোনও সামান্য ব্যাপার নয়। বর্তমানে সারা বাংলা জুড়ে পূজিতা এই সামান্য নারী দেবী মা মনসা হিসেবে সমাদৃতা।

একজন সাধারণ রমনীর মতই মা মনসার জীবন সংগ্রামে ভরা। জন্ম থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠা পাওয়া পর্যন্ত এই লড়াই তিনি করে গেছেন কখনও দাঁতে দাঁত চেপে, কখনও আবার রুখে দাঁড়িয়ে। কষ্ট পেয়েছেন আজীবন, প্রথমে পিতা তারপর স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করেন ঠিক কোনও সাধারণ নারীর মতই। কিন্তু তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, জবাব দিয়েছেন সব অন্যায়ের সেজন্য কোনও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেও পিছপা হননি একচুলও।

পুরাণ, মহাভারত এবং মঙ্গলকাব্যে মা মনসার বিভিন্ন কাহিনি বর্ণিত আছে। তবে অনেকাংশে তা বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে।

মনসার জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে নানা জনের নানা মত। পুরাণ অনুসারে ঋষি কাশ্যপের স্ত্রী কর্দু একটি নারী মূর্তি বানাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় মহাদেবের বীর্য এসে লাগে মূর্তির গায়ে। সৃষ্টি হয় মনসার। কিন্তু হিংসার বশে কোনওদিন তাঁকে মেয়ে হিসেবে মেনে নেয়নি দেবী পার্বতী। জন্মের পর সেই প্রথম উপেক্ষার স্বীকার হলেন তিনি। জন্মটাও সাধারণ ছিল কি? সৃষ্টির সেই আদি অকৃত্রিম নিয়ম মেনে জন্ম হল না যাঁর তার জীবনটাও যে নিয়ম মেনে হবে না সে তো বলাই বাহুল্য, তাই না?

দেবী ভাগবতে আবার এই কাহিনিটিকেও আর একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। অনেক অনেক কাল আগে পৃথিবী জুড়ে থাকা হাজার হাজার সাপেদের ভয়ে মানুষ নাকি কাশ্যপ মুনির কাছে যান। কাশ্যপ মুনি সব শুনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন

হন। ব্রহ্মার আদেশেই এই সাপের ভয় থেকে মুক্তি লাভ করানোর জন্য এক মন্ত্র বা বিদ্যার কথা ভাবছিলেন। সেই ভাবনা থেকেই মনসার জন্ম। মন থেকে জন্ম বলেই মনসা? পুরাণ তো তাই বলছে।

পরবর্তীকালে প্রবল ঈর্ষার বশে পার্বতী চন্ডীরূপ ধারণ করে এক চোখ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন ওঁর, তাই মনসার আরেক নাম 'চ্যাংমুড়ি কানি', কোনও কোনও অঞ্চলে তিনি এই নামেই পূজিতা। মা পেয়েও মায়ের স্নেহছায়া থেকে তিনি চিরকালের বঞ্চিতা এক নারী। মাতার মত পিতার কাছেও তিনি উপেক্ষিতা। অথচ সমুদ্র মন্থনের সময় মহাদেব যখন বিষপান করেন তখন এই কন্যাই তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, তখন থেকে তাঁর নাম হয়েছিল 'বিষহরি।' গ্রামবাংলার বহু জায়গায় তিনি এই নামেই পূজিতা হন। শোনা যায় বিষহরির গান।

বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পূজিতা হন তিনি। যেমন পদ্মে বসে থাকেন বলে কোথাও তিনি পদ্মালয়া আবার নিত্য পুজো দিতে হয় বলে কোথাও তিনি নিত্যাও বটে। জগৎকারু, জগৎগৌরি, নাগেশ্বরী, সিদ্ধ যোগিনী, জগৎকারুপ্রিয়া, আস্তিকমাতা, বিষহরী, শৈবী, মহাজ্ঞানযুতা, নাগ ভগিনী, বৈষ্ণবী— মনসা ছাড়াও এই এগারোটি নামে সারা বিশ্বে পরিচিত তিনি।

শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারতে ওঁর বিবাহ বৃত্তান্ত খুব সুন্দর করে বর্ণা করা হয়েছে। এক চোখহীন এক নারীর যে সহজেই বিয়ে হয়ে যাবে না তা অনুমেয়। তবু মনসার বিয়ে হয়েছিল কঠোর ব্রহ্মচারী ঋষি জগৎকারুর সঙ্গে। আর পাঁচটা ব্রহ্মচারীর মতই ঋষি পণ করেছিলেন আজীবন বিয়ে করবেন না। অথচ তাঁকে বিয়ে করতেই হয়, মহাভারতেই বর্ণিত আছে সেই গল্প।

কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন ঋষি। ধ্যান ভাঙলে পরিভ্রমণ শুরু করেন তিনি। একজায়গায় গিয়ে দেখেন তারই পূর্বপুরুষেরা গাছের সঙ্গে উলটো দিকে ঝুলে আছে। তিনি চিন্তিত হয়ে কারণ শুনতে গিয়ে জানতে পারেন, উত্তরসূরীর হাতে শেষকৃত্য হয়নি বলেই ওঁদের স্বর্গারোহণ হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁকে বিয়ে করতে হয় মনসা'কে। তাদের পুত্র আস্তিকের হাতের জল পেয়েই পরবর্তীতে মুক্তিলাভ করেন জগৎকারুর পূর্বপুরুষেরা। স্বামী-পুত্র পেয়েও মা মনসা সুখী ছিলেন না। রাগী ঋষির কোপের শিকার হয়েছিলেন বারবার। সঠিক সময়ে ঘুম না ভাঙানোর অপরাধে একবার তাড়িয়েও দিয়েছিলেন ঋষি তার স্ত্রীকে বলে জানতে পারা যায়।

স্বর্গে যে দেবী প্রতিষ্ঠা পান না, তাঁকে মর্ত্যের মানুষেরাও যে দারুণ মানবেন না এতো বোঝাই যায়। মনসার এই প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লড়াইটাই খুব যন্ত্রনাদায়ক। মা মনসার জীবনটা খুব ভালভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় কোথায় তিনি অন্যান্য দেবীদের থেকে আলাদা। তিনিই বোধহয় পুরাণে, লোককাহিনিতে বর্ণিত একমাত্র দেবী যিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মর্ত্যের মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য আসেন। নইলে এতদিন তো আমরা উল্টোটাই জেনে এসেছি। তাই না? মনসামঙ্গল কাব্য অথবা মনসা বিজয়কাব্য তো বিখ্যাতই মনসার এই লোকজ থেকে দেবতা হয়ে ওঠার লড়াই'এর কারণে।

মনসাকে নিয়ে লেখা যত বই পুঁথি আছে সব চাইতে জনপ্রিয় এই মনসামঙ্গল কাব্য। চাঁদ সদাগর ও মা মনসা কিম্বা বেহুলা লখিন্দরের গল্প লোকের মুখে মুখে ফেরে। চাঁদ সদাগরের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অত্যন্ত বেশি। মনসা স্থির করেন এই সদাগরের হাতেই নিতে হবে পূজা তারপরই পাবেন মর্ত্যে স্বীকৃতি। কিন্তু শিবভক্ত চাঁদ সদাগর অসম্মত হন। কিছুতেই তিনি পুজো করবেন না এই নারীর। রেগে গেলেন মা মনসা। কেড়ে নিলেন বণিকের ছয় পুত্র এবং সপ্তডিঙা। তবু রাজি নন চাঁদ। মা মনসাও নাছোড়। ইন্দ্রের সভার দুই নর্তক আর নর্তকী অনিরুদ্ধ আর ঊষাকে তাঁর ইচ্ছেতেই লখিন্দর আর বেহুলা রূপে জন্ম নিতে হয়। লখিন্দর হন চাঁদের সপ্তম সন্তান, আর ওঁর সঙ্গেই বিয়ে হয় বেহুলার।

একসময় বিয়ে হয় দু'জনের, স্বয়ং বিশ্বকর্মা নাকি লোহার বাসর ঘর বানান। কিন্তু মনসার ছলে একটা ছোট্ট ছিদ্র থেকে যায়। বাসর রাতে সেই ছিদ্র দিয়েই প্রবেশ করে এক সাপ এবং সর্পাঘাতে মৃত্যু হয় লখিন্দরের। বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য ভেলায় চেপে চলে যান মনসার কাছে, একটি মাত্র শর্তের বিনিময়ে ফিরিয়ে আনেন স্বামীসহ হারানো সবকিছু।

কী ছিল সেই শর্ত? চাঁদ সদাগর করবেন মনসার পুজো। করেছিলেন তিনি। কথা রেখেছিলেন পুত্রবধূর। মনসার দিকে পেছন ফিরে বাম হাত দিয়ে ফুল ছুঁড়েছিলেন, আর বলে উঠেছিলেন সেই অঘোম বাণী—

'যেই হাতে পূজি আমি দেব শূলপাণী, সেই হাতে পূজিব কি চ্যাংমুড়ি কানি?'

খুশি হয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকে মর্ত্যবাসীর দেবী হয়ে উঠেছিলেন মা মনসা।

গ্রামবাংলায় বিশেষ করে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্যতম দেবী মা মনসা। বিয়ের আগে বাড়িতে বসে মনসার গান। আবার চাঁদ সদাগর যেহেতু নিজে বণিক ছিলেন তাই বণিকদের মধ্যেও এই দেবীর পুজোর জনপ্রিয়। নানা জায়গায় নানা ভাবে পূজিত হন দেবী। মূর্তি ছাড়াও গাছের ডাল, মাটির পট কিম্বা মাটির পঞ্চ বা অষ্ট নাগকে নানা উপাচারে পূজা দিয়ে সন্তুষ্ট করা হয় এই দেবীকে।

মূলত সাপের উপদ্রবের হাত থেকে রেহাই পেতেই এর দেবীর পূজা করা হয়। তবে সন্তান জন্মের জন্যও এই দেবী পূজিত হন বলে কোথাও কোথাও মনে করা হয়।

সমগ্র উত্তরবাংলা জুড়েই এই দেবী সমাদৃতা। রাজবংশী ছাড়াও অনেকের বাড়িতেও রয়েছে মনসা মন্দির বা থান। জলপাইগুড়ি জেলাতে প্রাচীন রাজবাড়িতে গড়ে ওঠা মনসা মন্দিরে বসে বিরাট মেলা। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে হয় মনসা পূজা, দোকানপাটে সেজে ওঠে মন্দির চত্বর। ইদানিং মেলা দৈর্ঘ্য ও সময় দুটোই বেড়েছে চাহিদা অনুসারে। তাই জমজমাটও বেশি, জাঁকজমকও।

বহু সংগ্রামের পর, বহু উপেক্ষার পর মা মনসার এই স্বীকৃতি। তবু কোথায় যেন তা কাঁটার মত বাজে। মাঝেমধ্যেই মনে হয় অন্যান্য দেবীর চাইতে একটু যেন বেশিই ভয় পাচ্ছি আমরা মা মনসাকে। ভক্তিভরে যতটা না ডাকছি তার চাইতেই বেশি ওঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা। কিছুতেই যেন মায়ের কোপ দৃষ্টিতে না পড়ি তাই এই এত আয়োজন।

কী জানি হয়ত তাই, আবার হয়ত নয়। তবু যেন একটা প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যায়। পুরাণে যে নারী এত উপেক্ষিতা সেকি আদৌ পুরোপুরি দেবী হয়ে উঠতে পেরেছেন? নাকি আরও কিছুটা পথ চলা বাকি? সময় এত উত্তর দিয়ে যাবে তো? আপনাদের কী মনে হয়?

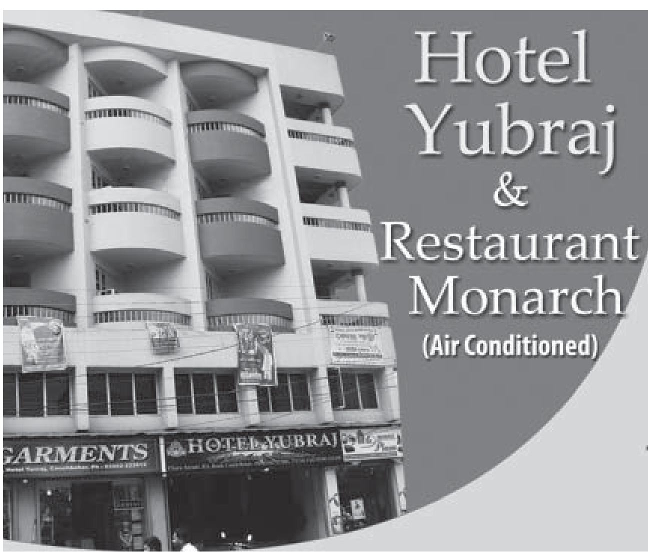

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch
(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC	Rs. 650	900
Deluxe AC	Rs. 990	1200
Super Deluxe AC	Rs. 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs. 2000	2000
Suite	Rs. 3000	3000
VIP Suite	Rs. 3500	3500
Extra Occupancy (N-AC)	Rs. 100	--
Extra Occupancy (SC)	Rs. 200	--

N.B. *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

ধারাবাহিক কাহিনি। পর্ব ২

তাজ্জব মহাভারত

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

৫

দিনের প্রথম প্রহরটা দুর্যোধন গদা অনুশীলন করেন। একটু আগেই সে অনুশীলন শেষ করে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মুশকো চেহারার এক ভৃত্য তাঁর গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছিল। দিনটা কালকের তুলনায় বেশ উষ্ণ। দুর্যোধন ভাবছিলেন সাঁতার কাটবেন। অনেকদিন শিকারে যাওয়া হয় না। দিন কয়েকের জন্য সঙ্গীসাথী-অনুচরদের নিয়ে গভীর অরণ্যে শিকারে গেলে বেশ উত্তেজনা হবে। উত্তেজনা না থাকলে মোটেই স্বস্তি পান না দুর্যোধন। সাধারণ মানুষের জন্য হস্তিনপুরে উত্তেজনার অভাব নেই, কিন্তু তাতে দুর্যোধনের মন ভরে না।

সাঁতার কাটার ইচ্ছে নিয়ে দুর্যোধন উঠে দাঁড়ালেন। ভৃত্যেরা ছুটল সারথিকে খবর দিতে। গায়ে একটি উত্তরীয় জড়িয়ে দুর্যোধন রথের দিকে কয়েক পা এগিয়ে চরমণিকে ছুটে আসতে দেখে দাঁড়ালেন। চরমণি তাঁর নিয়োগ করা ব্যক্তিগত গুপ্তচর। অনেক দিন হল সে কোনও সংবাদ আনছিল না। তাঁর ছুটে আসা দেখে দুর্যোধন বুঝলেন কোনও ভাল খবর আছে।

'চরমণি যে!' দুর্যোধন খবরের আশায় একটু উত্তেজিত বোধ করলেন। 'স্বাগত। অনেক দিন পর দেখলাম তোমাকে।'

'খবর আছে প্রভু!' চরমণি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল। 'এমন খবর যে আপনি বিস্মিত হয়ে ভাল উপহার না দিয়ে পারবেন না।'

'বটে।' দুর্যোধন আবার বসলেন। তারপর হাত তুলে বিশেষ ইঙ্গিত করতেই চারপাশে যারা ছিল তারা সবাই দূরে চলে গেল। চরমণি এবার ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'ভূতমিত্র ঋষির নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

'রাজকর্মচারিদের সন্তানদের পড়ান যিনি?'

'একদম ঠিক।'

'তিনি কিছু করেছেন?'

'তিনি একটি মাহুত পেয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত হাতির জন্য। ছেলেটি মনে হয় কামরূপের লোক। নাম ভুসুকু।'

'ঋষি মশাই-এর ভাগ্য ভাল বলতে হবে। মাহুত পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।'

'সে মাহুত সুরদত্তের কাছ থেকে এক থলে মোহর দিয়ে মশলা কিনেছে।'

'বলো কী? মাহুতের পারিশ্রমিক উঁচু হয় জানি, কিন্তু মশলা কেনার মত উঁচু হয় কি? তা-ও আবার সুরদত্তের কাছ থেকে। তা সে নিশ্চয়ই মহার্ঘ্য কাঁচা লঙ্কা কেনে নি?'

'আজ্ঞে সেটাই কিনেছে। একাধিক এক গন্ডা।'

'বলো কী?' দুর্যোধন যথেষ্ট উত্তেজনা অনুভব করলেন। সুরদত্ত বহু চেষ্টার পর গুটিকয় গাছে লঙ্কা ফলাচ্ছেন ইদানিং। লঙ্কা পিছু তিন থেকে পাঁচ মোহর দক্ষিণা দিতে হয়। তা-ও আগাম পয়সা দিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। তক্ষুনি তক্ষুনি পেতে চাইলে কম করে এক থলে মোহর দিতে হবে তাঁকে। বিনিময়ে একগন্ডা লঙ্কা পাওয়া যাবে।

'সে কি আগাম বলে রেখেছিল নাকি—'

'তা হলে কি আমি এভাবে ছুটে আসতাম?' চরমণির স্বর আরও ফিসফিসে হয়ে যায়। 'সেদিন সুরদত্ত যাবেন আত্মীয়ের বাড়ি। রথে উঠতে যাবেন —এমন সময় ভুসুকু নামের ছেলেটা উপস্থিত। তাঁর তক্ষুনি লঙ্কা লাগবে। তা সুরদত্ত প্রথমটায় আমল দিচ্ছিলেন না। শেষে ছেলেটা মোহরের থলে বের করছে দেখে বুঝলেন যে ব্যাপারটা গুরুতর! বললেন, এক থলে মোহরের বিনিময়ে বড় জোর পাঁচটা লঙ্কা সে পেতে পারে। ছেলেটি তাতেই রাজি। শুধু লঙ্কা নয়। আরও আধা থলে মোহর দিয়ে এক তোলা কালো জিরে নিয়েছে।'

'কী সাঙ্ঘাতিক!' দুর্যোধন প্রবল উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ে পাইচারি শুরু করে দিলেন। 'মানলাম ভুসুকু নামের ছেলেটি হস্তিবিদ্যা জানার কারণে ভালই উপার্জন করে। সে পয়সা জমিয়েছে। কিন্তু দেড় থলে মোহর দিয়ে সে মশলা কেন কিনবে? এর বদলে সে একটা দ্রুতগামী রথ কিনতে পারত! উৎকৃষ্ট কাপড় কিনতে পারত! সে কী খায় যে দেড় থলে মোহর দিয়ে কাঁচালঙ্কা আর কালো জিরে কিনেছে?'

'মাছের ঝোল।'

'মানে?' দুর্যোধন এবার সত্যিই মহাবিস্মিত হলেন। 'কী বললে কথাটা? মাছের ঝোল? ঝোল মানে কী?'

'ক্ষমা করবেন। এ আমি জানি না। পোড়া ছাড়া আর কোনও ভাবে যে মৎস্য ভক্ষণ করা যায় তা আমার জানা ছিল না। তবে যাই বলুন প্রভু! ভুসুকু নামক ছেলেটিকে একটু চোখে চোখে রাখার প্রয়োজন নয় কি?'

দুর্যোধন কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। কিছুটা দূরে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের অপেক্ষা করার স্থান। এতক্ষণ সেখানে কেউ ছিল না। কিন্তু এখন একজনকে দেখা যাচ্ছে। তাঁর চুলের রঙ ভারি বিচিত্র। এমন রক্তকেশ দুর্যোধন আগে দেখেন নি।

'একজন বিচিত্র মানুষকে দেখতে পারছি চরমণি। সাক্ষাৎপ্রার্থি।'

চরমণি ঘাড় ঘুরিয়ে ব্যক্তিটিকে পর্যবেক্ষণ করে বলল, 'যদিও আপনার তুলনায় কিছুই নয়, তবে চেহারাটি বেশ শক্তিশালী।'

'ডাকো তো ওঁকে।'

দুর্যোধনের আদেশ পেয়ে চরমণি হাতছানি দিয়ে লোকটিকে ডাক দিয়ে বলল, 'ভো ভো! এদিকে আসতে আজ্ঞা হয়।'

লোকটি ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। সত্যিই তাঁর চেহারাটি শক্তিশালী বটে। দুর্যোধন মনে মনে প্রশংসা করলেন। লোকটি দুর্যোধনের সামনে এসে প্রণাম জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দুর্যোধনের কথা এতদিন সে শুনে এসেছে। দূর থেকে কয়েকবার দেখেওছে। কিন্তু আজ সামনা সামনি ধৃতরাষ্ট্রের বড় ছেলেকে দেখে সে মুগ্ধ হল। আহা! কী সমীহ করার মত স্বাস্থ্য। যেন পাথর কুঁদে কোনও উচ্চ মানের ভাস্কর দেহটা তৈরি করেছে। সামান্য নড়াচড়াতেই মাংসপেশিতে ঢেউ ওঠে। অতি প্রশস্ত বক্ষ, সিংহের মত কটিদেশ, স্তম্ভের মত উরু —যেন সাক্ষাৎ এক শক্তি!

'কে তুমি?'

দুর্যোধনের প্রশ্নে লোকটি মাথা নিচু করে বলল, 'আমার নাম ধুর্জটিবর্মা।'

'হাঁ করে কী দেখছিলে?'

'আজ্ঞে এমন শক্তিশালী শরীর দেখতে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। তাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।'

'বটে!' দুর্যোধন খুশি হলেন। 'আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কিছু বিপদ আছে —সেটা জান নিশ্চয়ই? বহু সাক্ষাৎপ্রার্থীকে আমি কারাগারে পাঠিয়েছি। কয়েকজনকে সামান্য চপেটাঘাতও করেছি। তাঁদের কেউ কেউ এখনও পুরো স্মৃতি ফিরে পায় নি।'

'জানি মহারাজ!'

'মহারাজ হলেন আমার বাবা। আমি যুবরাজ।'

'আপনিই ভবিষ্যতের মহারাজ।'

'বাজে কথা বলো না। পদাঘাত করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভবিষ্যতে মহারাজ হবে যুধিষ্ঠির।'

'আমি একান্তে কথা বলতে চাই মহারাজ!'

'আবার মহারাজ? তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি!'

'আমার কথা পছন্দ না হলে যা খুশি শাস্তি দেবেন। অনুগ্রহ করে আপনার সঙ্গে থাকা লোকটিকে চলে যেতে বলুন। অতি গোপন এক সংবাদ এনেছি আমি।'

কয়েক পলক ধূর্জটিবর্মা চোখের দিকে তাকিয়ে দুর্যোধন বুঝতে পারলেন লোকটি মিথ্যে বলছে না। বাস্তবে দুর্যোধনের সামনে দাঁড়িয়ে এত শান্ত আর সাবলীলভাবে বাক্য বিনিময় করতে পারার ক্ষমতা যাঁর আছে তাঁকে সাধারণ বলা যায় না। লোকটি সম্পর্কে চরমণিও খুব আগ্রহ অনুভব করছিল। তাই

দুর্যোধনের আদেশে অনিচ্ছা নিয়ে স্থান ত্যাগ করল সে। যতই আগ্রহ থাক, আদেশ মানতে ক্ষণেক দেরি হলে দুর্যোধন মৃদু আঘাত করতে পারেন। সেটা হলে চরমণি বেশ কয়েক মাস বিছানা থেকে উঠতে পারবে না।

'এবার বলো।' দুর্যোধন কড়া স্বরে বললেন। 'তোমার গোপন খবর আমার পছন্দ না হলে কপালে দুঃখ আছে।'

'আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর নাম অল্লরাজ অঙ্গার।'

দুর্যোধন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে বললেন, 'কী বললে? অল্লরাজ অঙ্গার?'

'ঠিক তাই মহারাজ!'

'এটা রসিকতা হলে আমি তোমাকে দু-টুকরো করে ফেলব!'

'পরীক্ষা করুন?'

'অল্লারাজ অঙ্গার কে?'

'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মায়াবি। মায়াযন্ত্র বিদ্যায় তাঁর চাইতে প্রতিভাবান কেবল দেবতারা।'

'তাঁর প্রতীক কী?'

ধুর্জটিবর্মা উত্তর দিলেন না। শুধু ডান হাতটি দুর্যোধনের দিকে প্রসারিত করে দিলেন। দুর্যোধন সবিস্ময়ে দেখলেন যে ধুর্জটিবর্মার তর্জনির নখে একটি চিহ্ন আঁকা। একজোড়া সমান্তরাল কালো রেখা। আরেক জোড়া লাল রেখা সেই কালো রেখা দুটিকে সমকোণে ছেদ করেছে। সব মিলিয়ে যেন একটা পাশার ছোট্ট ছক।

হ্যাঁ। এটাই অল্লরাজ অঙ্গারের প্রতীকচিহ্ন। খুব কম মানুষ এটা জানে। দুর্যোধন উত্তেজনা প্রায় ফেটে পড়তে পড়তে নিজেকে সামাল দিলেন। রাজপুরুষদের উত্তেজনা প্রকাশ করা সমীচীন নয়।

'তুমি আমাকে অবাক করলে ধুর্জটিবর্মা।' ঘাম মুছে উত্তরীয়টা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে দুর্যোধন বসলেন। 'আশা করি অল্লরাজের চিহ্নের কথা অন্য কোনও সূত্রে জেনে নখের মধ্যে ছবি এঁকে তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছ না। বাস্তবে আমি বহুদিন ধরে অল্লরাজের সন্ধান করছি। এই প্রথম কেউ তাঁর খবর এনেছে। তুমি বসতে পারো।'

'আমি সম্মানিত মহারাজ!'

'এখন বলো, অল্লরাজ তোমাকে কেন পাঠিয়েছেন? তিনি কীভাবে জানলেন যে আমি তাঁর সন্ধান করছি?'

'তিনি কীভাবে কী করেন তা আমার অজানা। তবে তিনি আপনার জন্য একটি বিশেষ জিনিস পাঠাতে চান।'

'কী?'

'কালকূট।'

'কা-ল কূ-ট?!'

দুর্যোধন আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। জগৎ সংসারে যত বিষ আছে তার মধ্যে সেরা হল কালকূট। এই বিষের গন্ধ নাকে যাওয়ার কয়েক পলকের মধ্যে একটি অতি শক্তিশালী মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এক বিন্দু কালকূট একটি ঐরাবতের শরীরে প্রবেশ করলে সে হাতি সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়। কিন্তু কালকূট প্রস্তুত করা ভীষণ কঠিন। হস্তিনাপুরের সেরা রসায়ণবিদেরা বহু চেষ্টা করেও তা তৈরি করতে পারেন নি। মনে করা হয় যে গোটা বিশ্বে তিন কী চারজন কালকূট বানাবার ক্ষমতা রাখেন। তাঁর মধ্যে একজন অল্লরাজ অঙ্গার।

'তিনি কেন আমাকে কালকূট পাঠাবেন?' দুর্যোধন সাবধানি গলায় জিগ্যেস করলেন।

'অভয় দিলে বলতে পারি।'

'দিলাম।'

'ভবিষ্যতে আপনার মহারাজ হওয়ার পথে যত বাঁধা আছে তা কালকূট প্রয়োগ করে দূর করা সম্ভব।'

'কী বললে?'

দুর্যোধন চমকে উঠলেন। যুধিষ্ঠিরকে ভবিষ্যতের মহারাজা বলে মেনে নিলেও অন্তরে দুর্যোধন অন্য ভাবনা পোষণ করেন। কিন্তু সে ভাবনার কথা একমাত্র ছোট ভাই দুঃশাসন আর প্রিয় বন্ধু কর্ণ ছাড়া আর কেউ জানে না।

অল্লরাজ অঙ্গার জানল কীভাবে?

সত্যিই সে জগতের সেরা মায়াবি। কিন্তু কী চায় সে কালকূটের বিনিময়ে?

৬

ঋষি বেদব্যাস পদ্মাসনে বসে কিছু লিখছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে আসতে দেখে সে সব গুটিয়ে রেখে সহাস্যে বললেন, 'এসো হে! রাজ্যপাট সামলে শেষ পর্যন্ত সময় হল?'

'আর বলো না বন্ধু!' ধৃতরাষ্ট্র আসন গ্রহণ করলেন। 'আমি আর ক-দিন। ভালয় ভালয় যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে গেলেই আমি আর তুমি বসে বসে কেবল বিশ্বচর্চা করব আর ঘুমোব!'

'অত সোজা নয় বন্ধু!' মুচকি হেসে বললেন ব্যাসদেব। 'দুর্যোধন তোমার ছেলে হতে পারে কিন্তু তুমি তাঁকে জান না!'

'আহা! দুর্যোধনের মত ছেলে হয় নাকি? কর্ণটাই যত নষ্টের গোড়া। নইলে যুদ্ধ বলো, শাস্ত্র বলো, অশ্ববিদ্যা বলো— দুর্যোধনের মত আর কে আছে? মোট কথা, দুর্যোধন আমার সোনার ছেলে।'

'সে যাই বলো— ছেলের মাথা তোমার একটু মোটা।'

'ওই একটাই তো দোষ!' ধৃতরাষ্ট্র স্বীকার করে নিলেন। 'কিন্তু দোষটা বাদ দিয়ে বাকি দুর্যোধনকে বিচার করো! ও কি ইচ্ছে করলে ছোটভাই হিসেবে ভীমকে দুটো গদাঘাত করে শাসন করতে পারে না? কিন্তু একবারও করেছে? আর ভীম আবার গদাবিদ্যা শিখল কবে?'

ব্যাসদেব মিটিমিটি হেসে বললেন, 'তবে দুর্যোধন রাজা হতে চাইবে না বলছ?'

'কক্ষনো না! তা ছাড়া ভীষ্ম তো বলেইছেন যে দরকার রাজ্য দু-ভাগে ভাগ করে দু-জনকে রাজা বানিয়ে দেবেন। মোট কথা, দুর্যোধন আমার সোনার ছেলে।'

'ঠিক।' ব্যাসদেব গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিলেন। প্রসঙ্গ বদলে বললেন,'নারদমুনি এসেছিলেন শুনলাম?'

'ভীষ্মের অতিথি হয়ে আছেন। তবে আমার কিন্তু ওনার গান তেমন ভাল লাগে না। আসলে তোমরা তো কেউ দুর্যোধনের গান শোনো নি!'

ব্যাসদেব বিস্মিত হলেন। 'ও গান গায় নাকি?'

'ভাল বীণাও বাজায়।'

'হতেই পারে বন্ধু! তোমারই তো ছেলে। তুমিও তো শস্ত্রশাস্ত্রে সমান পারঙ্গম। চিত্রসঙ্গীতে নিপুণ। দুর্যোধনও বা হবে না কেন?'

ধৃতরাষ্ট্র খুশি হলেন। হালকা গলায় বললেন, 'বলো বন্ধু কী খাবে?'

'খাওয়ার আগে একটা কথা বলি?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই!'

'ছেলেরা কার সঙ্গে দেখা করছে, মিশছে— সে সব খবর রাখছ তো?'

'সে আর বলতে! গুপ্তচরেরা সব সময় নজর রাখছে।'

ব্যাসদেব যেন একটু স্বস্তি পেলেন। ধৃতরাষ্ট্র লক্ষ্য করলেন সেটা। বললেন, 'বিশেষ কিছু বলতে চাইছ কি বন্ধু?'

'হ্যাঁ। খুবই বিশেষ। সংবাদটা আমি পেয়েছিলাম সুদূর সিন্ধুনদের ওপাড়ের দেশ থেকে আসা এক জ্ঞানী মানুষের কাছে। কোশল রাজ্যে জ্ঞানীব্যক্তিদের এক সম্মেলনে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। সেখানে তিনি যখন জানলেন আমি আপনার বয়স্য, তখন আমাকে একটু বার্তা দিয়েছিলেন আপনাকে দেওয়ার জন্য।'

'শুনি সেই বার্তা।' ধৃতরাষ্ট্রকে কৌতূহলি দেখাল।

'সৈন্ধবরা প্রতিশোধ নিতে আসছে।'

'সৈন্ধব?' ধৃতরাষ্ট্র গভীর বিস্ময়ে তাকালেন ব্যাসদেবের দিকে। বহু যুগ আগে তাঁর পূর্বপুরুষেরা সিন্ধুনদীর তীরে থাকা এক নগর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সে নগরের নাম ছিল সৈন্ধব। ভীষণ এক যুদ্ধের পর নগরের সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু সে বহু বহু অতীতের কথা। এতদিন পর সৈন্ধবদের নাম উঠছে কেন?

'সৈন্ধবরা প্রতিশোধ নিতে আসছে— এটা কি কোনও হেঁয়ালি?' ধৃতরাষ্ট্র বললেন। 'এরমধ্যে কি কোনও তাৎপর্য অনুভব করছ?'

'সৈন্ধব নগর ধ্বংসের কথা তুমি ঠিক কী জান ধৃতরাষ্ট্র?'

'তাঁরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সিন্ধু অতিক্রমে বাধা দিয়েছিলেন। তাই যুদ্ধ হয়।'

'এটাই সবাই জানি। কিন্তু আসলে যা ঘটেছিল সেটা অন্য। লুঠ করার জন্য কোনও কারণ ছাড়াই সৈন্ধব নগর আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। কাজটা করা হয়েছিল এক রাতের মধ্যে।'

'হতেই পারে না। তবুও ধরে নিলাম হয়েছে। তারপর?'

'মনে করা হয়েছিল সৈন্ধব নগরের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কয়েকজন বেঁচে যায়। এরা ছোট একটি গোষ্ঠী বানিয়ে জঙ্গলে বসবাস শুরু করে। এভাবে বহুযুগ কেটে যায়। গোষ্ঠীর লোকজন বংশ পরম্পরায় অপেক্ষা করতে থাকে তোমাদের ওপর আঘাত হানার জন্য। কিন্তু বর্তমানে তাঁরা কোথায় কীভাবে আছে, কেউ জানে না। সিন্ধুপাড়ের জ্ঞানী মানুষটির বার্তা তাই উপেক্ষাযোগ্য নয় বন্ধু!'

ধৃতরাষ্ট্র মৌন রইলেন। বেদব্যাস কোনও কথা না ভেবে বলেন না। যে বার্তা সিন্ধুপাড়ের জ্ঞানী মানুষটি পাঠিয়েছেন, তা ভেবে দেখতে হবে।

'তুমি কি তাহলে সাবধান হতে বলছ ব্যাস? সীমান্তে সেনাসজ্জা বাড়িয়ে দেব?'

'সৈন্ধবরা যদি সত্যিই প্রতিশোধ নিতে আসে তবে সেনা নিয়ে আসবে না ধৃতরাষ্ট্র। সমরশক্তিতে হস্তিনাপুর অজেয়।'

'তবে?' ধৃতরাষ্ট্র খুশি হয়ে জিগ্যেস করলেন।

'বিভাজন।' ব্যাসদেব উঠে দাঁড়ালেন। প্রশস্ত কক্ষে কয়েকবার পাইচারি করলেন নীরবে। তারপর বন্ধুর কাছে এসে ধীরে ধীরে বললেন, 'যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনের মধ্যে বিভাজন তৈরি করবে। তুমি

ভেবে দেখ ধৃতরাষ্ট্র! কুরুবংশের ইতহাসে এই প্রথম সিংহাসনের অধিকার নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধের আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে। শুধু দরকার একটু ইন্ধন। তবে পাণ্ডবরাও এক সময় ভাবতে শুরু করবে যে দুর্যোধন যদি যুদ্ধ চায় তো যুদ্ধ হবে।'

'কী ভয়ঙ্কর!' ধৃতরাষ্ট্র শিউরে উঠলেন। 'কিন্তু দুর্যোধনের মত ছেলে কি—'

'ওর তো একটাই দোষ। মোটা মাথা। যেটা বুঝবে সেটাই বুঝবে। কর্ণের ব্যাপারে আটকাতে পেরেছিলে?'

'কিন্তু দুর্যোধনের কাছে ওরা আসবে কেন? যুধিষ্ঠিরের কাছেও তো যেতে পারে। অবশ্য সেখানেও আমার গুপ্তচর আছে।'

'ভীষ্মের চোখ এড়িয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা কঠিন। তুলনায় দুর্যোধনকে হাত করা সোজা।'

'তবে কী করি বলো তো?'

'দুর্যোধনের সঙ্গে কে কে সাক্ষাৎ করতে আসছে সন্ধান করো।'

'এক্ষুনি নিচ্ছি!'

ধৃতরাষ্ট্র হাততালি দিয়ে লোক ডাকিয়ে গুপ্তচর প্রধানকে ডেকে পাঠালেন। একটু পরেই সে হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করল।

'দুর্যোধনের সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ওপর নজর রাখছ তো?'

'আজ্ঞে রাজন! ওনার কাছে তো লোক খুব কম আসে। গত সাতদিনে দু-জন। একজন কাশীর নামযশপ্রার্থী কুস্তিগির। সে একটু বেশি কথা বলছিল বলে উনি আলতো করে একটি চাপড় মারেন। ফলে কুস্তিগিরকে চিকিৎসালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। দ্বিতীয়জন অবশ্য বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।'

'সেও কি চিকিৎসালয়ে?'

'না রাজন! তাঁকে একান্তে বসিয়ে উনি দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেছেন।'

'অসম্ভব!' ধৃতরাষ্ট্র ধমকে উঠলেন। 'দুর্যোধনের সঙ্গে বসে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করবে এমন প্রতিভা কেউ আছে নাকি? এরপর তো বলবে ভালমন্দ খাইয়েছে!'

'ঠিক ধরেছেন রাজন! মহাভোজের নির্দেশ গিয়েছিল পাকশালে।'

'ভাবতেই পারছি না! তা সেই সাক্ষাৎপ্রার্থীর পরিচয়?'

'নথী দেখতে হবে।'

ধৃতরাষ্ট্র কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ব্যাসদেব শান্ত স্বরে গুপ্তচর প্রধানের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যত শীঘ্র সম্ভব সাক্ষাৎপ্রার্থীর পরিচয় সহ যাবতীয় তথ্য আমাকে জানাও।'

'একদম তাই।'

প্রধান চলে গেল। ধৃতরাষ্ট্রকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তিনি কয়েক পা এগিয়ে খোলা জানালার ধারে দাঁড়ালেন। বাইরে সুসজ্জিত পুষ্পোদ্যানে বিচিত্র বর্ণের সমারোহ। পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। তিনি সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বন্ধুর উদ্দেশে বললেন, 'অত ভাবনার কিছু নেই বুঝলে? দুর্যোধনের মত ছেলে হয় না। মনে হচ্ছে গদাবিদ্যায় অভিজ্ঞ কেউ এসেছিলেন। যদিও দুর্যোধনের অজানা কিছু নেই এ বিষয়ে। কিন্তু অগ্রজদের সে সম্মান জানাতে জানে।'

'তা হলে তো খুব ভাল কথা।'

বেদব্যাস মৃদু হাসলেন। কুরুবংশ ভাল থাকুক। তিনি মনেপ্রাণে কামনা করেন। কিন্তু সিন্ধুপাড়ের জ্ঞানী মানুষটি আজ অবধি কাউকে ভুল কিছু বলেন নি। সে বাক্‌সিদ্ধ।

৭

দুপুরের ভোজন সমাপ্ত করে বিশ্রামকক্ষে আধশোয়া হয়ে বীণাবাদন শুনছিলেন ভীমসেন। বাদক সুদূর দক্ষিণ দেশের অসুর। এঁদের বীণার সুর তাল অন্যরকম। কিন্তু বেশ উত্তেজনাময়। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আসুরিক গানবাজনা বেশ উপাদেয় লাগে। আধা প্রহর পর খিদেও পায়। আজকের বাজনা যে খুবই ভাল হচ্ছে তার প্রমাণ ভীমসেনের খিদে পাচ্ছে— অথচ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মোটে দু-দণ্ড পেরিয়েছে।

ভীম উঠে বসলেন। দরজার কাছে দণ্ডায়মান ভোজন সচিব তাড়াতাড়ি ভীমসেনের কাছে এসে জিগ্যেস করল, 'ক্ষুধার্ত?'

'কিঞ্চিৎ।'

ভোজন সচিব দরজার দিকে মুখ করে হাঁক দিয়ে ডাকলেন, 'ভো ভো লড্ডুকবর!'

ভোজন নিয়ামককে দেখা গেল তালপাতা আর লেখনি সমেত দরজার সামনে দাঁড়াতে। পাশে একটা থালায় কালির পাত্র নিয়ে একজন।

'এক বৃহৎপাত্র শুষ্ক ননি, ঘৃতভর্জ্য শাক চ গমসিদ্ধ।'

নিয়ামক চলে গেল। ভীমসেন বীণাবাদককে একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে সচিবকে হতাশ গলায় বললেন, 'খাদ্যে বৈচিত্র্য আনো সচিব! একই খাবার নাম বদলে খাওয়াচ্ছ!'

'এটা খাদ্যবিশেষজ্ঞের প্রস্তাব বাহুবলী!'

'থামো তো!' ভীমসেন ধমকে উঠলেন। 'বিশেষজ্ঞ সমিতির সদস্যরা কেউ খেতে জানে? খায় তো ওই একঘেয়ে রাজভোগ! আমাকেও তাই খাওয়াচ্ছ! ঘি দিয়ে ভাল করে ভেজে গণ্ডা পাঁচেক চাপাটি পাঠাও। বিশেষজ্ঞ যা-ই বলুক, ওই গমসেদ্ধ খাওয়া যায় না! স্বাদ নেই অথচ গালভরা নাম!'

'আজ্ঞে! বিশেষজ্ঞের আবিষ্কার করা খাদ্য তবে—।'

'চাইলে তুমি খেতে পারো।'

'না। থাক। আমার উদর পূর্ণ।'

সচিব ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে যেতেই বীণাবাদক যন্ত্রের তার টানতে টানতে বললেন, 'খেয়ে আনন্দ পেতে চাইলে আমাদের অসুর মহানগরির কোনও একটায় আসুন। নিজে না যেতে পারলে রাজরাঁধুনিদের পাঠান।'

'রাঁধুনিগুলো হয়েছে আলস্যের কুম্ভ!' ভীম হাসলেন। 'কতবার বলেছি হস্তিনাপুরের অতিথিশালায় ভিনদেশিদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তাঁদের খাদ্যবস্তুর নাম আর রন্ধনকৌশল জেনে নিতে। কিন্তু ব্যাটারা পাকশাল ছেড়ে নড়বেই না। অবশ্যি ওরা না থাকলে রান্নার কাজে বিঘ্ন ঘটে। সেটাও মানতে হবে।'

'আপনি বরং এই কাজের জন্য কোনও ভোজন রসিককে নিয়োগ করুন। সে সন্ধের পর নগরে ঘুরে ঘুরে দেখবে কোথায় রান্নার সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তারপর সেখানে গিয়ে খোঁজ নেবে।'

ভীম উৎফুল্ল হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাধা পড়ল। একজন লোক হাঁফাতে হাঁফাতে কক্ষে প্রবেশ করে ভীমসেনকে প্রণাম জানাল। দেখে মনে হচ্ছিল ব্যক্তিটি অনেকটা রাস্তা দৌড়োতে দৌড়োতে এসেছে।

'কে তুমি?' ভীম রুষ্ট স্বরে জিগ্যেস করলেন। 'কে তোমাকে এখানে পাঠাল?'

'আজ্ঞে এই কক্ষে প্রবেশের অনুমতি আমার আছে। আমি আপনার আমিষ বিভাগের উপপ্রধান।'

'হাঁফাচ্ছে কেন?'

'এক অসামান্য সুবাস হে বাহুবলী! রান্নার সুবাস! সেই সুবাস পেয়েই ছুটতে ছুটতে আসছি। নয় তো আমি একপক্ষের ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছিলাম আজকে।'

ভীম বেশ অবাক হলেন। বললেন, 'রান্নার সুবাস পেয়ে তুমি ছুটি ভুলে আমাকে অবহিত করতে এসেছে জেনে খুশি হলাম। কিন্তু সে সুবাস কি সত্যিই কোনও রান্নার?'

'প্রথমে আমারও মনে হয়েছিল সুবাস কোনও অন্য কিছুর। কিন্তু গন্ধে আমিষত্ব টের পাওয়ার পর নিশ্চিত হলাম অভিনব কোনও আমিষ রান্না হচ্ছে।'

'কোথায়?'

'আজ্ঞে ঋষি ভুতমিত্রের আশ্রমের পেছন দিক দিয়ে যে সরু রাস্তাটা দিয়ে আমি বাসভবনে যাই, সেখানে। বাসভবন থেকে মালপত্র নিয়ে বিকেলের নৌকোয় বেরিয়ে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু এ সংবাদ আপনাকে না দিলেই নয়!'

'কী রান্না? অনুসন্ধান করেছিলে?'

'তা আর করি নি বাহুবলী! গন্ধের সূত্র ধরে আশ্রমের পেছন দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে দেখি একটা কুটির। সেই অপূর্ব সুবাস আসছে সেখান থেকেই। এগিয়ে গেলাম। দেখলাম এক অতি তরুণ ব্যক্তি কিছু একটা রান্না করছেন। সুগন্ধে চারদিক আমোদিত।'

ভীম উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে বললেন, 'তারপর?'

'জানলাম সেই ব্যক্তি মৎস্য রান্না করছেন। সে এক অপূর্ব রন্ধন কৌশল!'

হঠাৎ বীণাবাদক বললেন, 'মাছের ঝোল নয় তো?'

'মাছের ঝোল?' ভীমসেন বেশ বিস্মিত চোখে বাদকের দিকে তাকান। 'মৎস্যের এমন একটা রান্না সম্ভব বলে শুনেছি। পরম উপাদেয়। কিন্তু এর বেশি কিছু জানা নেই।'

'রান্নাটা কেমন দেখেছেন বলুন তো?' বীণাবাদক জানতে চাইলেন উপপ্রধানের কাছে। 'তরলের মধ্যে মৎস্যের খণ্ড? কবোষ্ণ চালের সঙ্গে মেখে—।'

'ঠিক তাই!' উপপ্রধান লাফিয়ে ওঠেন। 'ঠিক এই ভাবেই খেতে হয়। সুগন্ধি তরল, যাকে বলে ঝোল, তার মধ্যে সোনালি রঙের কোমল মৎস্যখণ্ড। ভেতরের সরু হাড় সরিয়ে খেতে হয়।'

ভীমসেন গম্ভীর গলায় জিগ্যেস করলেন, 'খেয়ে দেখেছ?'

'আজ্ঞে— যিনি রান্না করছিলেন তিনি ভুতমিত্রের হস্তিচালক। বড়ই মধুর ব্যবহার। আমাকে বললেন একটু খেয়ে যেতে। তবে তিনি আপনার জন্যেও—।'

'পাঠিয়েছেন?' ভীম লাফ দিয়ে উঠলেন। 'কোথায়?'

'আজ্ঞে পাকশালায় গরম করা হচ্ছে।'

ভীম আর অপেক্ষা না করে পাকশালের দিকে হাঁটা দিলেন। পাকশালের একটি কক্ষে তখন কর্মিরা ভিড় করেছেন। ছোট একটি পাত্রে যে জিনিসটি

গরম করা হচ্ছে, তা থেকে বেরিয়ে আসছে এক অপূর্ব সুবাস। মাছ থেকে এমন জিনিস হতে পারে তা বিশ্বাসই হত না যদি চোখের সামনে সেটা দেখা না যেত। ভীম সে ঘরের দরজায় থমকে দাঁড়ালেন। তারপর প্রাণপণে নাক টেনে অস্ফুটে বললেন, 'আহা! আহা!'

পাকশালে হৈ হৈ পড়ে গেল। ভীমসেনকে সমাদর করে বসিয়ে স্তূপীকৃত কবোষ্ণ অন্ন সাজিয়ে দেওয়া হল বিরাট সোনার থালায়। সুন্দর কারুকাজ করা রুপোর পাত্রে এনে রাখা হল মাছের ঝোল।

'কাঁচা লঙ্কা দেখছি!' ভীম পরম পুলকে ঝোলে ভাসমান লঙ্কাগুলোর একটা তুলে নিলেন। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় এগুলি কী?'

'আজ্ঞে কালো জিরে।' উপপ্রধান পাশ থেকে জানালেন। 'ঝোল প্রস্তুতির জন্য বহুমূল্য মশলার প্রয়োজন। তা ছাড়া মৎস্যখণ্ড থেকে হাড় বের করার কৌশলটিও জানতে হবে বাহুবলী!'

কিন্তু ভীমসেন ভোজন শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর চোখমুখ উদ্ভাসিত। মনে হচ্ছে তিনি স্বর্গে পা রেখেছেন। পর্বত প্রমাণ অন্ন মুহূর্তের মধ্যে উবে গেল। পরম তৃপ্তিতে ভীমসেন উদরে হাত বুলিয়ে বললেন, 'আঃ! কী খেলেম! জন্ম জন্মান্তরেও ভুলব না! কেবল গলার মধ্যে একটু অস্বস্তি হচ্ছে।'

'কাঁটা বোধহয় কয়েকটি আপনার গলায় আটকেছে বাহুবলী!'

উপপ্রধানের কথায় একটুকুও বিচলিত হলেন না ভীমসেন। স্মিত হাস্যে বললেন, 'বদ্যিকে ডাকো। আর ঋষি ভূতমিত্রের সেই হস্তিচালককেও ডেকে নিয়ে এসো। মহাসমাদর করে আনবে।'

একটু পরেই উপপ্রধান একটি রাজকীয় রথ নিয়ে ছুটলেন ভূতমিত্রের আশ্রমের দিকে। কিন্তু আশ্রমে ভুসুকুকে পাওয়া গেল না। সে নাকি খানিক আগেই আশ্রম থেকে বেরিয়েছে। একজন ঘোড়সওয়ার তাঁকে নিতে এসেছিল। ভুসুকু যাওয়ার সময় বলে গেছে, তাড়াতাড়ি চলে আসবে। হস্তিনাপুরে তাঁর দেশের আরও কিছু লোক নাকি এসেছে। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

ভীমের নির্দেশে হস্তিনাপুর জুড়ে ভুসুকুকে খোঁজা শুরু হল। কিন্তু তাঁর খোঁজ মিলল না। আশ্রমেও আর ফিরে এলো না ভুসুকু। সেদিন রাতে ফিরল না। পরদিন সকালেও না। সে যেন উধাও হয়ে গেছে।

৮

ঊষাকালে হিম পড়ে। যুধিষ্ঠির চাদরে মাথা ঢেকে হাঁটছিলেন। ভোরবেলায় পাখির ডাক শুনতে তাঁর ভাল লাগে। পাখিদের ডাক শুনে তাদের আলাদা করে চিনতে চেষ্টা করেন। বাগানের দিকে এই সময় চার ভাই-এর কাউকেই দেখা যায় না। তাঁরা যায় দ্রোণের কাছে। যুধিষ্ঠিরও যান। তবে রোজ নয়।

কিন্তু আজ বাগানে খানিক ঘোরাঘুরি করতেই ভীমসেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটি বেদিতে বিষণ্ণ চিত্তে বসেছিলেন। যুধিষ্ঠির একটু অবাক হয়ে বললেন, 'রাতে ঘুমোস নি?'

ভীম তাঁর ক্লান্ত চোখ তুলে বলল, 'ঘুমোব কী করে? গোটা রাতটাই তো খুঁজলাম।'

'কাকে?'

'ভুসুকুকে। ভূতমিত্রের মাহুত। মাছের ঝোল রাঁধতে জানে। স্বাদে যেন অমৃত। কিন্তু সে লোক কাল থেকে অন্তর্হিত!'

যুধিষ্ঠির কৌতূহলি হয়ে বসলেন। ভীম দাদাকে সংক্ষেপে গতকালের ঘটনার বিবরণ দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ভাগ্যটাই খারাপ রে দাদা!'

'কিন্তু সে কোথায় যেতে পারে?' যুধিষ্ঠির মোলায়েম স্বরে জিগ্যেস করলেন। 'ভুসুকু তো বলেই গিয়েছিলেন তিনি দেশের লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। হয়ত আজ ফিরে আসবে।'

'ভুতমিত্রের অনুমতি ছাড়া সে বাইরে রাত কাটাতে পারে না।'

'তবে তো বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হচ্ছে ভাই!'

'তুই ভাব। আমি অত ভাবতে পারি না। তবে অতিথিশালায় তাঁর দেশের লোকেরা কেউ গত এক মাসে আসে নি। করতোয়া দেশ থেকে খুব কম মানুষই এদিকে আসে শুনলাম।'

'যে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেছে তাঁর পরিচয় কিছু জানা গেছে কি?'

'তাঁকে কে দেখেছে?'

'ভূতমিত্রের দ্বার রক্ষীদের কেউ নিশ্চয়ই দেখেছে।'

ভীমসেন চুপ করে রইলেন। এটা তাঁর মাথায় আসে নি। যুধিষ্ঠির মৃদু হেসে ভীমসেনের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ঠিক আছে। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। মাছের ঝোল আমি কখনও খাই নি। শুনেছি সে নাকি অমৃত।'

'তার চাইতেও বেশি কিছু রে দাদা! কিন্তু অভাগা আমি! পেয়েও হারালাম!'

ভীমসেনের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। যুধিষ্ঠির তাঁকে আরেকটু সান্ত্বনা দিয়ে উঠে পড়লেন। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে হাঁক দিলেন, 'কে আছ?'

সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের আড়াল থেকে একজন দেহরক্ষী মাথা তুলে বলল, 'উপস্থিত!'

'হস্তিনাপুর নগরের সান্ত্রী প্রধানকে আমার কক্ষে আসতে বলো। গুরুতর বিষয়।'

আধা প্রহর পর দেখা গেল সান্ত্রী প্রধান বীরভদ্র হন্তদন্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরের মহলের একটি বিশেষ কক্ষের দিকে যাচ্ছেন। কক্ষে তিনি একাই অপেক্ষা করছিলেন। বীরভদ্র প্রবেশ করে মাথা নিচু করে প্রণাম করতেই তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'ভুসুকু নামক এক পূবদেশিয় অসুর যুবক বিষয়ে আপনি নিশ্চয়ই কিছু জানেন?'

'আমি জানি সে কোথায় আছে।'

'কোথায়?'

'ভুসুকুকে সান্ত্রীদের অনেকেই চেনে। কারণ সে হস্তিবিদ্বান। তাঁরা তাঁকে জনৈক অশ্বারোহীর সঙ্গে বিদেশি পাড়ায় একটি বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। সে বাড়ি থেকে সে বের হয় গভীর রাতে। সঙ্গে একজন ব্যক্তি। তিনি ভুসুকুকে একটি রথে উঠিয়ে বিদেশি পাড়ার পূব দিকে রাষ্ট্রদূতদের জন্য নির্মিত ভবনগুলির একটিতে নিয়ে যান। পরে ব্যক্তিটি বেরিয়ে এসে রথ নিয়ে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভুসুকু সে ভবনেই থেকে গেছে বলে আমাদের ধারণা।'

'কোন রাষ্ট্রের ভবনে প্রবেশ করেছিল ওরা?'

'সাগর দেশ।'

'সে দেশ বিষয়ে কী জানেন আপনি?'

'বহু ছোট ছোট দেশের দূত হস্তিনাপুরে থাকেন। এরা সবাই হস্তিনাপুরের কৃপাপ্রার্থী। এদের বিষয়ে আমাদের বিশদ কিছু জানা নেই যুবরাজ! আসলে প্রয়োজন হয় নি।'

'পুরো ব্যাপারটা কি আপনার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে?'

'সত্যি বলতে হয় নি। তবে দ্বিতীয় পাণ্ডব যেমন উত্তেজিত ছিলেন তাতে মনে হয় সংবাদ পেলে নিজের বাহিনী নিয়ে দূতাবাস আক্রমণ করতেন। ফল ভাল হত না। বিদেশি পাড়ায় আমরা তেমন কোনও কারণ ছাড়া অনুসন্ধান চালাতে পারি না। রাষ্ট্রদূতদের মহলে প্রবেশ করতে হলে মহারাজের আদেশ চাই। উনি উত্তেজনা বশতক্ষ্য কিছু ঘটিয়ে ফেললে পিতামহ কুপিত হতেন। মধ্যম পাণ্ডবের শাস্তি হত।'

'আপনি উচিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' যুধিষ্ঠির চোখ বুঁজলেন। কিছু ভাবছেন তিনি।

'এ তথ্য আপনি চেষ্টা করবেন গোপন রাখতে।' একটু পরে চোখ খুলে তিনি বললেন।

'মহারাজ জানতে চাইলে আমি বলতে বাধ্য। কিন্তু এই তুচ্ছ বিষয় তাঁর কাছে পৌঁছবে না বলেই অনুমান। তবে, আমার আরও কিছু বলার আছে যুবরাজ।'

'যেমন?' যুধিষ্ঠির শান্ত চোখে তাকালেন বীরভদ্রের দিকে।

'যে ব্যক্তি রথে করে ভুসুকুকে গভীর রাতে সাগর দেশের দূতাবাসে নিয়ে যায় তিনি সম্প্রতি দুর্যোধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁর নাম ধূর্জটিবর্মা।'

'নিশ্চিত?'

'তাঁর মত অমন লাল চুল হস্তিনাপুরে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির নেই। শিরস্ত্রাণ পরে রথে উঠছিলেন বটে— কিন্তু চুল পুরোটা ঢাকে নি।'

'লাল চুল? কোথাকার মানুষ তিনি?'

'লঙ্কাদেশের নাগরিক বলে জানিয়েছিলেন। দুর্যোধনের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি নেবার কালে।'

যুধিষ্ঠির কোনও কথা বললেন না। চোখ বন্ধ করে আবার ডুবে গেলেন ভাবনায়। তার আগে অবশ্য হাতের ইশারায় বীরভদ্রকে জানিয়ে দিলেন বাইরে অপেক্ষা করতে। আধ প্রহরের একটু কম সময় অপেক্ষা করার পর বীরভদ্র দেখলেন যুধিষ্ঠির কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছেন। তাঁর কপালে সামান্য ভাঁজ। চলে যাওয়ার আগে বীরভদ্রকে বললেন, 'যে ভাবেই হোক অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সাগর দেশের দূতাবাসের অবস্থান, বসবাসকারী লোকের সংখ্যা প্রভৃতি তথ্য সন্ধের আগে যেন আমি জানতে পারি। আপনি প্রয়োজনে আমার নিজস্ব গুপ্তচর বাহিনীকে কাজে লাগাতে পারেন। মনে হয়ে সেটা করলেই ভাল হবে।'

বীরভদ্র কিছু একটা রহস্য অনুমান করে উত্তেজনা চেপে রেখে বললেন, 'আদেশ শিরোধার্য।'

যুধিষ্ঠির নিজের মহল থেকে বেরিয়ে সারথিকে ডেকে বললেন, 'যাও। ভীমসেন বাদে বাকি তিন ভাইকে যেখানে পাবে তুলে নিয়ে আসবে।'

সারথি রথ ছোটাল। রাজপুত্রদের বিদ্যার্জনের সুবিধার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থশালা আছে। তা যুধিষ্ঠিরের মহল থেকে দুশো হাত দূরে। সেখানে বহু মূল্যবান পুথি রয়েছে। সব চাইতে বড় কথা সে গ্রন্থশালার মহানিয়ামক হলেন ব্যাসদেব। তিনি এখন হস্তিনাপুরেই।

ভুসুকুর ঘটনায় কোথাও জানি রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন যুধিষ্ঠির। তিনি গ্রন্থাগারের দিকে হাঁটা দিলেন।

(ক্রমশ)

বড় গল্প

শিখা-শাশ্বতিকী

তপতী বাগচী

দাবাগ্নিতে ঝলসে গিয়েছে গভীর অরণ্যভূমি। দীর্ঘ মহীরুহের দল দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো অঙ্গারময় শাখা-প্রশাখা নিয়ে, অসংখ্য ভস্মীভূতের মাঝে মাঝে। সবুজ পত্রাবলির কলকাকলী স্তব্ধ। স্তব্ধ সমস্ত প্রাণস্পন্দন... যেন কেউ নির্মম আক্রোশে হত্যা করেছে সুকোমল প্রাণ... ফেলে রেখে গেছে কঠিন স্থির দেহ।

এখন শীতল এই বনভূমি। শিশিরে ভিজে যাচ্ছে মাটি। গাছগুলির কালো কান্ড বেয়েও গড়িয়ে নামছে তারা অশ্রুর মত। পোড়া, আধপোড়া পাতার গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে, বয়ে যাচ্ছে মৃতের স্পর্শের মত ঠান্ডা হাওয়ায়। আঁধার এখনও বিছিয়ে রেখেছে তার কোমল আচ্ছাদন। যেন আলো না হয়, যেন এ জঙ্গলের আত্মা তার নিজের এই দগ্ধ-প্রত্যঙ্গ দেহ দেখে শিউরে না ওঠে।

তবু, আলো প্রকাশিত হয়। প্রেমময় কয়েকটি উষ্ণ আঙুল পত্রবিরল শাখা-প্রশাখার ফাঁক দিয়ে ছুঁয়ে ফেলে অগ্নিদগ্ধা, এক বৃদ্ধার ললাট। নিঃশেষিত প্রাণ তিনি বহুকষ্টে পক্ষ্মহীন চোখ খুলতে চেষ্টা করলেন। তাঁর সেই আচ্ছন্ন দৃষ্টি এক নিমেষ যেন খুঁজে বেড়াল কাউকে। তারপর আবার ফিরে গেল অন্ধচেতনায়।। তার আগে শুধু একবিন্দু হাসির ছায়া ক্ষণমুহূর্তে ভেসে গিয়েছিল ঠোঁটে। অসাড় অস্তিত্ব যেন কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন কোনও এক স্পর্শ-কল্পনায় কেঁপে উঠেছিল...। না... না... এ সত্য নয়... এ বিভ্রম মায়া হয়ত মৃত্যুকালীন ঘোর...

—দেবী! মায়া নয়, কুহকও নয়, তাকাও... দেখ... আমি এসেছি তোমার সন্নিধানে...

সত্য তবে? এই মৃদু পরশ ...কপালে... শীর্ণ জরাগ্রস্ত দু'পায়ে ...আজ... এখান? আশ্চর্য! এত দিন পর? দীর্ঘশ্বাসবায়ু উঠে আসে প্রাণের অতল থেকে। প্রথমতা মনে পড়ে যায়... গাঢ় নিশ্চেতনা থেকে ধীরে ধীরে স্মৃতিরা ছুটে আসে। ক্লিষ্ট... দগ্ধ... ওষ্ঠদুটি অস্ফুটে বলে ওঠে —কেন এসেছেন মহীয়ান? আজ?

—আজই তো সেই সময়, যখন সুদূর পর্যন্ত জীবনের নিবিড় বিস্তার তোমায় আত্মস্থ করেছে... অন্তর্মুখী তুমি, আজ তোমার দুচোখে নিবিষ্ট সময়ের শান্তি।

—সত্য অর্যমা, এ জীবনের তটজুড়ে কত বিচিত্র ঘটনার তরঙ্গাঘাত! আজ সব শান্ত। আজ আমার ভিতরে কোনও স্পৃহা সন্তাপ কিচ্ছুটি নেই... দশদিকে জীবনের চিররহস্য... তার মাঝে এই নির্বান্ধব বিশ্বে আমি একা... শূন্যকরতল...

তাঁর শিথিল উচ্চারণ অনুচ্চ মন্ত্রের মত অরণ্যের শীতল বাতাসে ভেসে যায়।

বড় কোমলস্বরে, দগ্ধক্ষতের ওপর অবলেপের মত উত্তর এল —তাই তো কাছে এসেছি তোমার...

—কিন্তু কেন হে পরিব্রাজক? আমি যে নিঃশেষ আমিতো... আর আপনার কামনার উৎস হতে পারি না পরাক্রমী আপনাকে পাবার আশায় আমি কোনও মন্ত্রোচ্চারণও করিনি!

—অগ্নিবন্যায় অবগাহন করে তুমি আজ শুচিশুদ্ধা হয়েছ সতী তুমি শিখা-শাশ্বতিকী। সমস্ত ইন্ধনে জ্বলে জ্বলে জীবনের খাদ পুড়ে শেষ হয়েছে। তুমি সকলের শ্রদ্ধেয়া তোমার ব্যক্তিত্বের কাছে আজ আমিও নতজানু

—এ জীবন ধন্য আমার দেব। আমি এ পৃথিবীর সামান্যা নারী, ভুলে ভরা আমার জীবন... নিষ্ঠুরা নিয়তির হাতের নিরুপায় পুত্তলি... লাঞ্ছিতা সর্বত্র। আপনি সুমহান আজ আমার কাছেই নতজানু? কেন দুর্ধর্ষ?

—অসিতনয়না, আজও, তুমি সেদিনের কথা ভুলতে পারনি? সেদিনও তুমি এই একই সম্বোধন করেছিলে।

—ভোলা যায়? সেই নিষ্ঠুর ধর্ষণ?

—ধর্ষণ!! কি বলছ পৃথা?

—মনে পড়ে দেব, আমি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম... যাবার আগে আমাকে চেতনায় ফিরিয়ে তবে আপনাকে যেতে হয়েছিল...?

—তীব্র রমণসুখে আছন্ন হয়ে পড়েছিলে তুমি। আমি তোমার ঘোর কাটিয়ে বিদায় চেয়েছিলাম মাত্র।

—সুখ? হে উষ্ণবীর্য! আপনার পরিতৃপ্তিটুকু নিয়ে আপনি প্রস্থান করেছেন। আমার সুখের কথা ভাববার সময় তো আপনার ছিল না... শরীরেরও তো একটা মন থাকে হিরণ্যরেতাঃ, তাকে সম্মত করানোর সে মধুর আচরণ আপনার জানা ছিল না...?

—তুমি তো সম্মতা ছিলে ভাবিনী... বালিকা স্বভাবে বুকে চলে এসেও নখে আঁচড়ে দিয়েছিলে আমার বক্ষদেশ... আহ্লাদে, বিস্ময়ে সম্ভাবনা উপ্ত হয়েছিল উর্বরা ভূমিতে...

—হ্যাঁ, আমি আত্মসমর্পণ করেছি। কেননা আপনি ইচ্ছা করেছিলেন, ক্রমাগত ইচ্ছা করেছিলেন। আপনি ভীতি-প্রদর্শন করেছিলেন, আমার জন্মদাতা পিতা এবং পালকপিতা দুজনকেই আত্মীয় পরিজনসহ ধ্বংস করে দেবেন।

—আমি তোমারই মন্ত্র দ্বারা আকৃষ্ট ও আহূত ছিলাম দেবী...

—আমি তখন নবীনা... ঋষি দুর্বাসার বর পেয়ে নিছক কৌতূহলে ভেবেছি... পুরুষ কেমন? সে কি সত্যি সত্যি বশ হয়? না বুঝে ভুল করেছিলাম। অনুনয় করেছি করজোড়ে... বারবার বলেছি ফিরে যেতে... আপনি পুরুষপ্রবর, দৈহিক বলীয়ান... নারী আপনাদের কাছে শুধুই উদযাপন...

—তুমিও তো উন্মুখী ছিলে রমণীয়া... নীবিবন্ধ মোচন করতে ছুঁয়েছি তোমার মধুকূপী নাভি... তুমি কেঁপে উঠেছিলে। বিলোল শরীরে নির্বসনা হয়েছ অকাতরে। যৌবনের উদযাপন পুরুষের একার?

—আমি... আমি সম্মোহিত ছিলাম দেব... প্রথম যৌবনে... প্রথম পুরুষ-স্পর্শ... আমার দেহবোধ সমস্ত হিতাহিত কেড়ে নিয়েছিল....

-ঋষি দুর্বাসা তোমাতে সন্তুষ্ট ছিলেন। অতএব তোমার জীবনে আমিই প্রথম পুরুষ কিনা সে একমাত্র তুমিই জান দেবী। কিন্তু সম্মোহিত তুমি ছিলে না... প্রখর পার্থিবজ্ঞানে আমার কাছে শর্ত রেখেছিলে। আলিঙ্গিতা অবস্থায়ই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলে সঙ্গমোত্তর সতীত্বের। সুবর্ণ কবচ-কুন্ডলযুক্ত মহাধার্মিক প্রতাপান্বিত পুত্রজন্মের প্রার্থনা করেছিলে... ভেবে দেখলে এ তো বিনিময়...

—বিনিময়? হয়ত বা, কিন্তু আমি এর নিয়ন্তা নই। আমি শুধু বিনিময়ের বস্তুটি...

—এ কথা কেন বলছ কল্যাণী?

—যথার্থ বলেছি দেবপুরুষ। আর্যক শূরের অগ্রজাতা আমি। সেই বালিকা বয়েসে সানন্দে আমাকে দান করা হল সম্পূর্ণ অপরিচিত এক নিঃসন্তান রাজাকে ...দাতার গর্বে। যেন আমি একটি মূল্যবান রত্নপেটিকা, একটি জড় পদার্থ মাত্র...। আমার শ্রীময়ী পুত্রবধূ দ্রৌপদীকেও পাশাখেলায় বহুমূল্য সামগ্রীর মতই বাজি রেখেছেন ভুভারতখ্যাত ধার্মিক সৎ যুধিষ্ঠির! নারীর কোনও সম্মতির প্রয়োজন হয় না কোনও ক্ষেত্রেই... তাই না?

—রাজা কুন্তীভোজ তোমাকে আত্মজার মতই সমাদরে রেখেছেন শৌরসেনী...

—এই ভ্রম আমারও ছিল। আমি তাঁর আত্মজা হলে, সেই উগ্র-স্বভাবা অভিশাপ-প্রবণ ঋষি দুর্বাসার তুষ্টির জন্য তিনি আমাকে নিয়োগ করতে পারতেন? প্রকৃতপক্ষে, পুত্রসন্তান জন্মানোর পর কুন্তীভোজ নিজের বংশধারা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব আমার রূপ-যৌবনকে ঢালের মত ব্যবহার করতে তাঁর কোনও দ্বিধা হয়নি। রাজ্যের মান মর্যাদা রক্ষার্থে ঋষি দুর্বাসার কোপাগ্নির মুখে কিশোরী পালিতা কন্যাকে আহূতি

দিতে দু'বার ভাবেননি তিনি। কখনও কি এ সত্য অনুধাবন করেছেন বিবস্বান, দ্রৌপদী যেমন করে রাজসভামধ্যে অপমানিতা হবার পরও পঞ্চস্বামীকে বাঁচিয়েছেন নির্বাসন থেকে, আমিও ভোজরাজ্যকে ঐ কোপন-স্বভাবা ঋষির করাল অভিশাপ থেকে বাঁচিয়েছিলাম...

—রাজা কুন্তীভোজ-এর বিশ্বাস ছিল তুমি মুনিবরকে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করতে পারবে। বিষধর সর্পকে গুণীন যেভাবে কৌশলে নম্র করে রাখে, তুমি দুর্বাসার ক্রোধকে তোমার স্নিগ্ধসেবার দ্বারা তেমনি প্রশমিত রেখেছিলে।

—আমি সেদিনও বাধ্য ছিলাম নিজস্ব অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে। পালকপিতা আমাকে সতর্ক করে বলেছিলেন— দেখো বাছা, পথ কিঞ্চিৎ সংকীর্ণ ও বংকিম। বুঝে শুনে চ'লো। তোমার জন্মদাতা পিতার এবং আমার দুজনেরই সম্মান যেন বজায় থাকে...

—দৃষ্টি সামান্য প্রসারিত কর কুন্তী, মেধাবিনী তুমি, বিশেষ-পারঙ্গমা। তোমাকে দায়িত্ব দিয়ে কুন্তীভোজ তোমার ক্ষতি কিছু করেননি। ঋষি দুর্বাসার বরে তুমি তোমার নির্বাচিত পুরুষের ঔরসে সন্তানলাভ করেছ। ভূ-ভারতে এই বিরল সৌভাগ্যশালিনী একমাত্র তুমি ভেবে দ্যাখো দেবী, তুমি চারবার প্রসবিনী হয়েছ। ...মুনিবর হয়ত তোমার ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন মানসচক্ষে... তাঁর এই বর ব্যতীত পঞ্চ-পাণ্ডব আর কীভাবেই বা সম্ভব ছিল? কীভাবেই বা সম্ভব ছিল মহাবীর কর্ণের জন্ম?

—তাঁর বর সম্পূর্ণ সত্য ছিল না...

—ঋষি দুর্বাসার বরদানে অসত্যতা! কোথায় পেলে পৃথা?

—আপনারই ক্ষেত্রে...

—কৌতুককর...! কীভাবে?

—মহর্ষি বলেছিলেন মন্ত্রে আহুত দেবতা বশীভূ ত হবেন, ব্যবহার করবেন আমার ভৃত্যের মত... আপনি আমাকে পর্যুদস্ত করেছেন...

—হয়ত মহর্ষি অনুমান করেননি যে, তুমি না বুঝে এ মন্ত্রের প্রয়োগ করবে... তোমার মন্ত্রে ছিল সঙ্গমের আহ্বান... নিক্ষিপ্ত শর ফিরে আসে না রমণী... তুমি আমন্ত্রিত অতিথিকে অপমান করতে পার না...

—কুমারী কন্যার গর্ভ...। সমাজ পরিবার রাজনীতি... সমস্ত চক্ষুর আড়ালে তাকে বহন করলাম... জন্মের পরেই আমি আমার রক্তের প্রথম ফসলকে নির্বাসন দিলাম... আপনি অনুমানেও আনতে পারবেন না সেই শূলবিদ্ধতার যন্ত্রণা। ব্যর্থ হল আমার প্রথম মাতৃত্ব... জীবনে আমি তাকে আর কাছে পেলাম না...

—স্থির হও... পাণ্ডবজননী...

—পুরুষ আপনি! কী করে জানবেন দুগ্ধপীড়িত স্তনের যন্ত্রণা... অমৃত কীভাবে গরল হয়ে ওঠে...। দু খণ্ড পাথর হয়ে উঠেছিল আমার বুক। দিন রাত অসহ্য প্রদাহ... উত্তপ্ত শরীর... অন্তঃপুরের গোপনকক্ষে ধাত্রীকন্যার ভেষজ পরিচর্য্যায় আমি জীবন ফিরে পেয়েছি। আর আপনি বলেছিলেন আমি কুমারীই থেকে যাব!

—তোমার বিগতশ্রম বুঝি। কিন্তু আমার আর কোনও উপায় ছিল না। সেকথা না দিলে তুমি কি তখন আমার কাছে আসতে? আমি তো তোমায় কুমারীকালীন ত্বক ফিরে পাবার গোপন উপায় বলে দিয়েছিলাম...

—আপনারা সকলেই এক সারির প্রবঞ্চক... আমার জন্মদাতা, আমার পালকপিতা, ঋষি দুর্বাসা... আপনি সূর্যদেব, আমার স্বামী পাণ্ডু... আরও আরও কত নাম বলব... শরাগ্রগুলি সারা শরীরে বিঁধে আছে... শরশয্যা কি কেবল শ্বশুরদেব ভীষ্মের?

—তোমার নিজের দিকে তাকাও পৃথা ...আজ নিজেকেও বিশ্লেষণ করে দ্যাখো... তোমার ভাণ্ডারেও হিংসা আছে, ঈর্ষাবিষ, ঘৃণা আছে। ঐকান্তিক আত্মবলি যেমন আছে সমানুপাতিকভাবে আছে প্রতিশোধ-স্পৃহা।

—এ কুরুযুদ্ধে কে নির্বিষ ছিলেন ভাস্কর? আপনি নিশ্চয়ই জ্ঞাত প্রত্যেকটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে... ক্ষুদ্র যে কীট তাকেও ঈশ্বর আত্মরক্ষার্থে দংশন ক্ষমতা দিয়েছেন। পিতৃহীন পুত্রদের রক্ষা করা, তাদের প্রাপ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা আমার কর্তব্য...

—আর তোমার প্রথম পুত্র কর্ণ? তার প্রতি এই কর্তব্যপালন কী প্রকারে সমাধা করলে দেবী?

—সে আমার কঠিন সাধনা।

—তোমার সাধনা? বিচিত্র! অঙ্গরাজ্যের

আমাকে তিনিই বলেছিলেন "আপৎকালে স্ত্রীলোক উত্তমবর্ণের পুরুষ অথবা দেবর থেকে পুত্রলাভ করতে পারে"। পুত্রার্থে তিনিই আমাকে বারবার প্রেরণ করছিলেন। পুত্র তিনি পেয়েছেন। সেজন্য আমি কার অংকশায়িনী হব সেটা আমার নিজস্ব পছন্দের বিষয়। তাছাড়া তিনি বিদুরকে দাসীপুত্র বলে কখনও অবজ্ঞা করেননি। বরঞ্চ অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল তাঁদের।

চম্পানগরীতে অশ্বনদীতীর থেকে নবজাতককে কুড়িয়ে পেলেন সস্ত্রীক সূত অধিরথ...

—সেটাই প্রচারিত...। বলুন মার্তন্ড, আমার বিবাহের পরেই তাঁরা চম্পানগরী থেকে হস্তিনাপুরে চলে এলেন কেন পুত্রকে অস্ত্রশিক্ষা দেওয়াতে? সূতপুত্রের অস্ত্রশিক্ষার কী প্রয়োজন? তার হাতে তো অশ্বরশ্মিই যথেষ্ট...

—হায় প্রিয়া! এ যদি নিছকই সমাপতন না হয়ে তোমার গুপ্ত-পরিকল্পনার ফসল হয়ে থাকে, তাহলে আপন পুত্রহত্যার পথ তুমি আপনি প্রস্তুত করেছো ...। একই অস্ত্রগুরুর কাছে কর্ণ এবং তোমার অন্য পুত্রদের একত্রে পাঠিয়ে তুমি নিজেকে কোন মহৎ সমদর্শিতার গরিমা দিলে?

—কর্ণ প্রার্থনা করলেও অস্ত্রগুরু দ্রোণ কর্ণকে শিষ্যত্ব দিতে অস্বীকার করেন সূতপুত্র বলে। তবে একথাও সত্য যে কর্ণ পরোক্ষভাবে দ্রোণেরই শিষ্য। একলব্য যেমন।

—রহস্যময় পৃথা তোমার দাবী। প্রতীতি হয় না। কোনও গূঢ়পুরুষ নিয়োগ করেছিলে কি?

—আমি নই। কর্ণের আগ্রহে অধিরথ এবং রাধা তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের আরেক পুত্রের উপর দায়িত্ব ছিল অস্ত্রগুরুর প্রশিক্ষণ স্বচক্ষে দেখে এসে পুংখানুপুংখ ভাবে কর্ণের কাছে বর্ণনা করা। তাঁদের আপনি সামান্য ভাববেন না, তাঁরা বহু ত্যাগ এবং সহিষ্ণুতায় বসুষেণকে যোগ্য করে তুলেছেন। আমার গোপন রক্তকে আমি উপযুক্ত স্থানেই প্রেরণ করেছিলাম...

—তথাপি তুমি কর্ণকে কুরুবংশ-পরিচয় দাওনি অর্জুন-জননী... বংশ-পরিচয়ের অর্থ রক্ত অভিমুখ স্থির করা... সুবর্ণ সুযোগ তোমার এসেছিল...

—এসেছিল দেব। অপুত্রক স্বামী যখন পুত্রাকাংক্ষায় উন্মাদপ্রায়, বলেছিলেন, "রাণী, যদি তোমার কানীন পুত্রও থেকে থাকে তুমি তাকে নিয়ে এস, আমি দত্তক নেবো পিতৃপরিচয় দেব তাকে..."

—বিচিত্রবীর্যের অকালমৃত্যুর পর সত্যবতীর কানীন পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন আহূত হলেন, রাণী অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য। সেই জারজ দ্বৈপায়ন যদি এতখানি সম্মানিত হতে পারেন, তোমার পুত্র হয়েও কর্ণ কেন ব্রাত্য প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকল কুন্তী?

—কর্ণ তখন বালকমাত্র। অধিরথ এবং রাধাকে সে পিতামাতারূপে ভালবেসে ফেলেছে। সেই স্নেহের আশ্রয় থেকে আমার স্বার্থে তাকে উৎখাত করতে চাইনি... ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণা তো আমি জানি।

—পুত্রবধূ দ্রৌপদীর মত তুমিও পঞ্চ-পুরুষগামিনী। আরও তিনবার তুমি ভিন্ন ভিন্ন ঔরসে গর্ভিণী হলে... তোমার সেই মিশ্র-রক্তের সন্তানেরা রাজপুত্র বলে পরিচিত হল। আর সূর্যপুত্র, সে রইল অপরিচয়ে... অপমানে... অথচ যুধিষ্ঠির এবং কর্ণ দুজনেই অর্জুনের বৈপিত্র সহোদর ভ্রাতা...

—সে সব স্বামীর ইচ্ছানুসারে ঘটেছিল... তাঁর অনুরোধে ...তাঁর অজ্ঞাতে আমার কাম চরিতার্থ করতে আমি কাউকে আহ্বান করিনি... ক্ষেত্রজ সন্তান তিনিই চেয়েছিলেন...

—নারীর হৃদয়গতি বড়ই দুরূহ...। মহামতি ব্যাস... শতযূপের আশ্রমে বসে যে কথার নির্লজ্জ-প্রকাশ করলেন— "যিনি ধর্ম, তিনিই বিদুর, যিনি বিদুর তিনিই যুধিষ্ঠির" এর প্রকৃত অর্থ কি তোমার স্বামী জানতেন? তিনি জানতেন কি, ধর্মপুত্র বলে যাঁর পরিচয়, তিনি আসলে তোমার প্রেমিক-দেবর বিদুরের পুত্র?

—আমাকে তিনিই বলেছিলেন "আপৎকালে স্ত্রীলোক উত্তমবর্ণের পুরুষ অথবা দেবর থেকে পুত্রলাভ করতে পারে"। পুত্রার্থে তিনিই আমাকে বারবার প্রেরণ করছিলেন। পুত্র তিনি পেয়েছেন। সেজন্য আমি কার অংকশায়িনী হব সেটা আমার নিজস্ব পছন্দের বিষয়। তাছাড়া তিনি বিদুরকে দাসীপুত্র বলে কখনও অবজ্ঞা করেননি। বরঞ্চ অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল তাঁদের। মহামতি বিদুর ধর্ম নামেই প্রজাদের কাছে সুখ্যাত।

—কুরুবংশ দ্বিচারিতাময়। শুদ্রাণী সত্যবতীর বিবাহপূর্ব অবৈধপুত্র ব্যাস। তার ঔরসে আরেক শুদ্রাণী দাসীর অবৈধ গর্ভজাত বিদুর। অথচ সত্যবতীর নির্দেশে ভীষ্মের অভিভাবকত্বে তিনি রাজপুত্রদের সঙ্গে একইভাবে প্রতিপালিত হলেন...। সমাজেও গৃহীত হলেন অনায়াসে... রাজবাড়ির প্রশ্রয়ে...। জারজ পুত্রসূত্রে বিদুর সত্যবতীর স্নেহের জারজ পৌত্র...। প্রকাশ্য বিরোধিতা না থাকলেও

আড়ালে গোপনে প্রজাদের মধ্যে এর কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি বলতে চাও?

—বিদুর সর্বদা কুরুবংশের মঙ্গলের জন্য সক্রিয় থেকেছেন। কখনও তার অন্যথা হয়নি... রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রণাদাতার পদ তিনি নিজ যোগ্যতায় অর্জন করেছিলেন।

—অবশ্যই। সেই সঙ্গে অর্জন করেছেন স্বীয় পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে আসীন করবার প্রভূত সুযোগ...

—পিতৃসিংহাসন প্রাপ্য ছিল পান্ডু-পুত্র যুধিষ্ঠিরের। অথচ... এত ক্লেশ-যাপন, এত ষড়যন্ত্র... এত প্রাণক্ষয়... অতঃপর ন্যায় পেয়েছেন তিনি।

—ন্যায়? ন্যায়ধর্ম কি বস্তু তা জানে পাণ্ডবেরা?

—ক্রোধবশতঃ আপনি আমার সন্তানদের হেয় করছেন অর্কদেব। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। তাঁর ধর্মনিষ্ঠা বিশ্ববিদিত।

—কে? সেই সুবিনয়ী ঘাতক? যুদ্ধের প্রাক-মুহূর্তে যে গুরুজনদের চরণবন্দনার ছলে তাঁদেরই বধ করবার কৌশল জেনে আসে? অনৃত ভাষণের পাপে যার ভূমি-অস্পর্শ রথ নেমে আসে মাটিতে?

—যুদ্ধে কৌশলের উপযুক্ত প্রয়োগ এই প্রথম নয় সপ্তাশ্ব!

—তুমি স্ত্রীলোক। রণনীতি সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান তোমার নেই। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে উভয়পক্ষের সম্মতিতে যে নিয়মবন্ধন হয়েছিল তার প্রথম এবং সর্বাধিক উল্লঙ্ঘন হয়েছে পাণ্ডবদের দ্বারা। কুরুযুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, দুর্যোধন এঁদের হত্যা কোন ন্যায়ধর্ম পালন করে ঘটেছে? কপটী ধূর্ত কৃষ্ণের প্ররোচনায় কাপুরুষ পার্থ আমার মহান বীরপুত্র কর্ণকে শস্ত্রহীন অবস্থায় হত্যা করেছে ঘৃণ্য উপায়ে অন্যায়ভাবে। একে ধর্মযুদ্ধ আখ্যা দেওয়া যায় না কিছুতেই...

—দোষী আমি। সত্যবতীর মত নিজের কানীন সন্তানের জন্মকথা জানাতে পারিনি পুত্রদের...

—সেই তুমিই পাণ্ডবদের প্রাণভিক্ষা করতে গিয়েছিলে পুত্র কর্ণের কাছে। তখন তোমার কুণ্ঠা হয়নি তাকে প্রলোভন প্রদর্শন করতে। প্রকৃতই মহাধার্মিক আমার পুত্র। রাজ্যলোভ, নারীলোভ, ঐশ্বর্যলোভ কোনও কিছুতেই সে মিত্রত্যাগ করতে রাজি হয়নি। সমাজ-স্বীকৃত সন্তানদের জন্য তোমার সেই প্রচেষ্টা অত্যন্ত ঘৃণ্য পৃথা... রাজমাতার মর্য্যাদালোলুপ ছিলে তুমি...

—আমি সাধারণী, দেবী নই... নির্লোভ, অহিংসক দাবি করি না নিজেকে...

—তুমি বিরল প্রতিভা পার্ষ্ণিদেবী... তোমার নৃশংসতা অসাধারণ। বারণাবতে দরিদ্রা নিষাদজননীকে পাঁচ পুত্রসহ আমন্ত্রণ করে গুরুভোজন করালে, সুরা পান করালে, তাঁরা তোমাকে দয়াবতী পুণ্যশীলা বলে কতনা সাধুবাদ জানাল। সরল সহজ নির্দোষী সেই নিষাদমাতাকে পঞ্চপুত্র সহ জীবন্ত দগ্ধ করতেও তোমরা পিছপা হওনি। নিরীহ পুরোচনও জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে তোমার ধার্মিক প্রেমিক মহামতি বিদুরের ইশারায়। ঘাতিকা তুমি!

—আত্মরক্ষার্থে। অন্যথায় আমরাই দগ্ধ হতাম...

—একটি বছর ধরে সেই সুযোগ কি আসেনি পুরোচনের? শুধুমাত্র কৌরবদের চোখে ধুলো দেবার উদ্দেশ্যে এই হত্যা। সেই পাপে আজ জীবন্ত দগ্ধ হলে তুমিও...

—পরম্পরার বিষদাঁতে আমি যেভাবে ছিন্ন হয়েছি বার বার, এই দহন তো তার চেয়ে অনেক নম্র

—জয়ী তো তুমিই, রাজমাতার সম্মানে গরবিনী...

—হে পূষণ, আপনি সর্বজ্ঞ। আমার অন্যায়ের শেষ নেই। কিন্তু এই মহাযুদ্ধ কেবল পাণ্ডব এবং কৌরবদের দ্বন্দ্বে ঘটেনি। এই সংঘর্ষের অন্যতর আরও কারণ ছিল। দ্রোণ-দ্রুপদ, ভীষ্ম-শিখণ্ডী, কৃষ্ণ-দুর্যোধন আরও অনেক প্রতিস্পর্ধী তাঁদের যুগ যুগ লালিত বদ্ধ-বৈরিতা তাঁরা চরিতার্থ করেছিলেন ওই আঠেরোটি দিনে। আমি শুধু জানতাম, আমার স্বামীর সিংহাসন তাঁর পুত্রদের প্রাপ্য। ক্ষত্রিয়া রমণী আমি। যুদ্ধকে ভয় পেলে আমার চলে না।

—অবশ্যই। যখনই যুদ্ধের বিপরীতে সিদ্ধান্ত এগিয়েছে তুমি এবং তোমার পুত্রবধূ দ্রৌপদী শাণিত যুক্তিতে সে সম্ভাবনা নষ্ট করেছ...

—বনবাসের ক্লেশ, কামুক জয়দ্রথের পাঞ্চালীকে অপহরণের প্রচেষ্টা, রাজসভায়

তুমি বিরল প্রতিভা পার্ষ্ণিদেবী... তোমার নৃশংসতা অসাধারণ। বারণাবতে দরিদ্রা নিষাদজননীকে পাঁচ পুত্রসহ আমন্ত্রণ করে গুরুভোজন করালে, সুরা পান করালে, তাঁরা তোমাকে দয়াবতী পুণ্যশীলা বলে কতনা সাধুবাদ জানাল। সরল সহজ নির্দোষী সেই নিষাদমাতাকে পঞ্চপুত্র সহ জীবন্ত দগ্ধ করতেও তোমরা পিছপা হওনি। নিরীহ পুরোচনও জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে তোমার ধার্মিক প্রেমিক মহামতি বিদুরের ইশারায়। ঘাতিকা তুমি!

কেশাকর্ষণ করে নিয়ে গিয়ে বিবস্ত্রা করার উদ্যোগ, অকথ্যকথনে অপমান এসবের বিচার তো হয়নি অর্চিষ্মান। মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম, তেজস্বী দ্রোণ এঁরা তখন নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। হয়ত তাঁরা তখন ধর্মের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব চিন্তা করছিলেন।

—ভাবো। একবার ঘটনাশৃংখলগুলো ক্রম অনুসারে স্পর্শ করে দ্যাখো দেবী, এ সবের কিছুই হয়ত হত না যদি কর্ণ পরিত্যক্ত না হত। যে দিন তুমি কর্ণকে ভাসিয়ে দিলে, সেদিনই নিয়তি নিহিত হয়ে গেল কুরুক্ষেত্র।

—নিয়তি বটে। যদি সেই নির্মম শিরশ্ছেদের পূর্বমুহূর্তে অর্জুন ক্ষণিক স্তব্ধ হত, যদি সে একবার অঞ্জলিতে তুলে নিত কর্ণের সমস্ত মান অভিমান... হয়ত রাজ্য ধন সিংহাসন এসব কিছুই তাঁর দাবী ছিল না। শুধু সম্মান, শুধু স্নেহ-ভালবাসা, ভাই হয়ে ভাই-এর পরিচয়, এসবের জন্যই কাঙ্গাল ছিল সে।

—আজ আর বিলাপ করো না তাঁর জন্য। সারল্য দেখিয়ো না। বার বার অহেতুক সম্মানহানি হয়েছে তার। অস্ত্রবিদ্যা-পরীক্ষা মঞ্চে, পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরসভায়। কুন্তী, তুমি নীরব দর্শক ছিলে। পুত্রদের কঠিন দ্বৈরথে অবতীর্ণ করিয়ে দিয়ে কৌতুক উপভোগ করেছো তুমি...

—দেবভাস্কর, আমি না হয় নারীসুলভ লজ্জায় পারিনি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো কর্ণের যথার্থ পরিচয় নির্ভুল জানতেন। তিনিও কেন যুদ্ধের পূর্বে তা পাণ্ডবপক্ষকে জানালেন না? তিনি তো শান্তি-প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন কৌরবদের কাছে।

—শ্রীকৃষ্ণ? আদৌ তিনি শান্তি চেয়েছিলেন কি? যিনি জরাসন্ধের ভয়ে নিজে পলাতক হয়ে ছিলেন। ভীম পর্যন্ত শেষ মুহূর্তে এসে শ্রীকৃষ্ণকে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ! তিনি বিপরীত যুক্তিতে ভীমকে পূর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষিপ্ত করে তুললেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তোমার পুত্রদের বশে এনে জরাসন্ধের বিপরীতে এক বৃহৎ শক্তি-শিবির গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁর রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল।

—তিনি তো অনুতপ্তও হয়েছেন। জোড়হস্ত হয়ে বলেছেন গান্ধারীকে, "দেবী আমি আপনার পুত্রহন্তা, আমি মিত্রদ্রোহী ও মূঢ়। আপনার রাজ্যনাশের একমাত্র হেতু আমি। আপনি আমাকে অভিশাপ দিন।" অবশেষে এই আত্মধিক্কারও তো তাঁরই।

—এও তাঁর কৌশল। কোনও সারবস্তু নেই এতে। শান্তি যদি কেউ আনতে পারতেন তিনি হচ্ছেন তোমার শ্বশুর-মহাশয় ব্যাস। তিনি সংসার-ত্যাগী যোগী হলেও রাজনীতির তপ্তস্বাদ তাঁর বড় প্রিয়। তিনি বার বার হস্তিনাপুরে উদয় হয়েছেন। অপরাধী যেমন বার বার ঘুরে ফিরে তার অপরাধ-ক্ষেত্রে চলে আসে।

—তিনিও তো গিয়েছিলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে।

—গিয়েছিলেন। তবে তাঁর চেষ্টায় কোনও আন্তরীকতা ছিল না। যেভাবে তিনি পাণ্ডুকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, যেভাবে গান্ধারীর গর্ভচ্যুত মাংসপিণ্ড তাঁর পরিচর্য্যায় শতপুত্রে পরিণত হল, যেভাবে একচক্রা নগরীতে সপুত্রক তোমাকে ব্রাহ্মণগৃহে ঠাঁই করে দিয়েছিলেন, তাঁরই অলৌকিক রূপকথায় বিশ্বাস করে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ কৃষ্ণার পঞ্চস্বামীগমন বিষয়ে আপত্তি ত্যাগ করেছিলেন, সেই প্রচেষ্টা যুদ্ধবিষয়ে কোথায় ছিল?

—তিনি কেনই বা যুদ্ধের সমর্থক হবেন? তিনি প্রাজ্ঞ, উদাসীন, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী।

—সমস্তই তোমার অবগতিতে ঘটেছে প্রিয়া, অজ্ঞতার ভান ক'রোনা। তোমারই মত ব্যাসেরও লক্ষ্য ছিল শান্তনুর সিংহাসন। অম্বিকা, অম্বালিকা তাঁকে সঙ্গমের সময় যে অপমান করে ছিলেন, যে যান্ত্রিকতায় তাঁর বীজ গ্রহণ করেছিলেন, সন্ন্যাসী ব্যাসের পুরষকার তাতে আঘাত-প্রাপ্ত হয়েছিল। সেই ক্ষতে পরম উপশম দিয়েছিল এক অনামী অঙ্গনা। সরলা মধুরা যৌবনা সেই দাসীর মুগ্ধ আত্ম নিবেদনে ব্যাসের ঔরসে যে পুত্রের জন্ম হয়েছিল, সেই বিদুরই ব্যাসের সমধিক প্রিয়। শুদ্রাণীপুত্র বলে বিদুরের ক্ষেত্রে সিংহাসনলাভ সম্ভব হয়নি। বিদুরের পুত্র যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত্রে তা সম্ভব করতে একনিষ্ঠ ছিলেন ব্যাস। ঠিক এই কারণেই তাঁর আচরণ পাণ্ডবদের প্রতি, বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের বিষয়ে পক্ষপাতদুষ্ট...

—যুধিষ্ঠিরের প্রতি জ্যেষ্ঠগণ সকলেই অত্যন্ত

স্নেহপ্রবণ তাঁর নিজগুণেই।

—দৈব তার সহায়। পাশাসক্ত, আরামপ্রিয় তাকে রাজা হবার জন্য বিশেষ কিছুই করতে হয়নি। স্বীয় বীরত্বে কিছুতেই অনন্ত-যৌবনা দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির অর্জন করতে পারতেন না। পরার্জিত রমণী কুমারী যাজ্ঞসেনীর কৌমার্য্য যাতে যুধিষ্ঠিরই প্রথমে হনন করতে পারেন, পরাশর পুত্র ব্যাস তার ব্যবস্থা পাকা করে দিয়েছিলেন। আর তুমি মাতা কুন্তী, কিছুপূর্বে অভিযোগ করছিলে নারীর সম্মতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। পঞ্চস্বামীগমনে পাঞ্চালীর সম্মতি তুমি নিয়েছিলে কি? নারী হয়ে কন্যাসমা আর এক নবীনা নারীকে পাঁচ পাঁচটি পুরুষের যৌনতাড়নার মুখে ঠেলে দিলে?

—আমি পঞ্চপুত্রের চোখে তাদের বাসনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। অন্যথায় ভাতৃদ্বন্দ্ব উপস্থিত হত।

—সেই রাজনীতির যূপকাষ্ঠেই বলি হলেন অর্জুনবধূ। প্রথাবিরুদ্ধ এক বিচিত্র বিবাহ, ন্যক্কারজনক তার নিয়ম, অবশ্য যদি একে আদৌ বিবাহ বলা যায়। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সমযোনিতে গমন করছেন মহানন্দে। পাঞ্চালীরও কোনও বিকার হয়নি এতে। এঁকে বেশ্যা বলতে সেহেতু কোথাও আটকায়নি পুত্র কর্ণর। তোমার পুত্রের অধিকারবলে এই অগ্নিশিখার মত নারী যদিও কর্ণেরই প্রথমভোগ্যা ছিলেন ধর্মত...

—দেব দিনকর, আমরা মানুষ। এইই তো পার্থিব জীবন। এখানে স্থির, অনড়, অটুট বলে কোনও ভালও নেই, চিরস্থায়ী কোনও মন্দও নেই। ঘটনাকে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে দেখুন। এই অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধ ও তার যা কিছু পরিণাম সেসব কোনও কিছুই আপনার বিক্ষিপ্ত, বিস্ময়কর বলে মনে হবে না।

—এই নির্মোহ দর্শন যা উচ্চারিত হল তোমার বয়ানে, শেষ পর্যন্ত এই-ই কি তোমার একমাত্র অর্জন কুন্তী? তোমার কোনও বাসনা নেই? কিছু চাওয়া নেই আর?

ক্ষণিক স্তব্ধ হলেন কুন্তী। বিচিত্র তাঁর এ জীবনের পরিক্রমা। রাজকন্যা তিনি। রাজবধূ। রাজমাতাও বটে। অথচ কোথাও, পিতৃকুলে শ্বশুরকুলে পুত্রদের ছত্রছায়ায় কখনও কি শান্তি পেয়েছেন তিনি? যাঁর কাছে ক্ষণিকের স্নিগ্ধ প্রেমস্পর্শ পেয়েছিলেন, সেই বিদুরকেও তো তাঁকে ব্যবহার করতে হয়েছে পুত্রদের স্বার্থে...। এখনও মনে পড়ে সেই রাজসভা। সমস্ত রাজন্যবর্গের সঙ্গে বসেছেন রাজ্যের গণমুখ্যরা, বণিকেরা। কুরুকুল জ্যেষ্ঠরা, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গাঙ্গেয় ভীষ্ম, বেদ-বিভাজক ত্রিকালদর্শী ব্যাসদেব। অবরোধের আড়ালে তাঁরা তিন নারী। তিনি, সত্যবতী এবং গান্ধারী। প্রকাশ্যে অবিচলিত থাকতেই হয়েছে তাঁকে, কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত সতর্ক। একটি পদক্ষেপ ভুল হলেই এই পঞ্চ-পুত্রসহ পুনরায় বনে ফিরে যেতে হবে। তখন যুধিষ্ঠিরের ষোল, ভীমের পনর, অর্জুনের চোদ্দ এবং নকুল-সহদেবের তের বৎসর মাত্র। এই পাঁচটি বনবাসী কিশোর যদি পাণ্ডুপুত্র বলে স্বীকৃতি না পেত, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সমস্তই ব্যর্থ হত। ব্যাসদেব, বিদুর এবং ভীষ্ম এঁদের গুপ্ত বৈঠক এবং সেখানে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভার রাশ শক্ত হাতে ধরেছিলেন তাঁরা। যাঁর নিজের জন্মই নিয়োগপ্রথার ফল, সেই ধৃতরাষ্ট্র বসেছিলেন বিচারাসনে ভাতৃবধূ কুন্তীকে কামুকী চরিত্রহীনা প্রমাণ করতে। কেবল একটি ঘটনা-সূত্রই বারে বারে কুন্তীর পক্ষে চলে আসছিল। যুধিষ্ঠিরের জন্ম-সংবাদ। রাজ্যবাসী যথাসময়ে জানতে পেরেছিলেন, পাণ্ডুর ইচ্ছাক্রমেই কুন্তীর এই ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্ম হয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রজ পুত্রদের অস্বীকার করলেও যুধিষ্ঠীরকে তো সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারীরূপে মেনে নিতেই হত... খুব কি অন্যায় ছিল সেদিনের সেই দাবি?... অথচ এত তাপ, এত রক্তক্ষয়, এত ঘৃণা, এত শত্রুতা... কুন্তী নিজেকেও যুদ্ধের দায় থেকে মুক্ত ভাবতে পারেননি কখনও...

পৃথা বড় শান্ত কণ্ঠে বললেন— আর কী বাসনা থাকতে পারে বিভাবসু! আপনি অবগত, মানুষের অন্তরাত্মাই তার বন্ধু এবং শত্রুও। কৃত অকৃত সকল কর্মের সাক্ষীও তার অন্তরাত্মা। যখন রণভূমিতে যুদ্ধে রত আমার পুত্রেরা... আমি জেনেছি, আমার জ্ঞাতিশত্রু আমারই প্রথম পুত্রের বীরত্বের উপর নির্ভর করে আমার বাকী পুত্রদের অধিকার আত্মসাৎ করতে উদ্যত..। পরস্পর যুযুধান আমার দুই পুত্র... আমার অন্তরভূমিই তখন কুরুক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। অহর্নিশ আমি শুনেছি অশ্বক্ষুরধ্বনি, হস্তি বৃংহণ, অস্ত্রের ঝনৎকার, কুলনারীদের করুণ তীব্র আর্তনাদ। বীর মহাবীরদের রক্তস্নাত মৃতশরীর নিয়ে শৃগাল শকুনদের টানাটানির দৃশ্য আমাকে স্থির থাকতে দেয়নি। পাঞ্চালীর পাঁচ পুত্র, অভিমন্যু, ভীমপুত্র ঘটোৎকচ, তার পুত্র অঞ্জনপর্বা হত। আমার প্রথম পুত্রের শোণিত মাখা ছিন্নমুন্ড ভূলুণ্ঠিত। দিবারাত্র নিজেরই সঙ্গে নিজের তীব্র সংঘর্ষ... সমস্ত চিতা রচিত হয়েছিল এই পৃথার চিত্তভূমিতে...

—কল্যাণি, তুমি শ্বশ্রু এবং শ্বশ্রুমাতা জ্ঞানে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে নিজহাতে দিবারাত্র সেবা করেছ তাঁদের সমস্ত অসহযোগিতা বিস্মৃত হয়ে। এই দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসরে তাঁদের বেদনা ও ক্রোধ অনেকাংশেই শমিত। তার পরেও তুমি রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করে তাঁদের সঙ্গে চলে এসেছ আশ্রমজীবনে। তুমি ধীর, প্রশান্ত... কল্যাণি, বড় তৃপ্ত মনে হচ্ছে তোমাকে দেখে...। তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতি আমাকে আরও শ্রদ্ধাশীল করেছে তোমার সিদ্ধান্ত-শক্তি, তোমার এই অপার স্থৈর্য্য...

—ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে, তুলাদণ্ডের আর কোনও আন্দোলন থাকে না তমোঘ্ন...। হতপুত্রা গান্ধারীর হাত ধরে হতপুত্রা আমি এসেছিলাম এই অরণ্যে। সে যন্ত্রণায় শীতল উপশম দিয়েছেন তপস্বী ব্যাসদেব। তাঁর যোগবলে ভাগীরথী তীরে অন্যান্য মৃত বীরদের সঙ্গে যখন কর্ণ দৃশ্যমান হলেন... আমার অন্য পুত্রেরা ধাবিত হয়েছে তাকে আলিঙ্গন করতে... এরচেয়ে মহত্তর আর কিছু নয়... আমার পাপ সন্তাপ সমস্ত ম্লান করে এই অমৃতটুকুই আজ আমার উজ্জ্বল সম্বল। ভবিষ্যতের কাছে শুধু একটিমাত্র প্রার্থনা... অপরিচয়ের অন্ধকারে, এই মেদিনী যেন কোনও দিন আর ভাতৃহন্তার খড়্গচ্যুত রক্তে সিক্ত না হয়...

থরথর করে কাঁপছিল যে ঠোঁট দুটো ধীরে ধীরে স্থির হয়ে এল। আলোর অনির্বাণ আঙুলগুলি গাঢ় মমতায় থেমে রইল ললাটে। দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে নামল দগ্ধ কপোলে। হু হু করে উঠল বাতাস, শোকে আতুর হল দগ্ধ বনভূমি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : কালিপ্রসন্ন সিংহ, রাজশেখর বসু, সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রতিভা বসু, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, অমিতাভ মৈত্র, অনুপম মুখোপাধ্যায়।

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page
Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

ধারাবাহিক থ্রিলার। পর্ব ২

মরা মৌমাছির চোখ

সাগরিকা রায়

ইদানিং বাড়ির যত্রতত্র ভূত দেখতে পায় সকলে। সম্পত্তির অংশ নিয়ে পরিবারে টানাপোড়েন চলছে। শীতের কুয়াশায় একা ছাদে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে। সে কি প্রেত? দিদির বাড়িতে দম আটকে আসে কঙ্কার। কেউ হাসে না এখানে। বয়স কী করে উনিশে থেমে আছে জবালার!

(৭)

ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা কমপ্লিট হওয়ার পর যখন শুয়ে বসে দিন কাটছে না, তখন দিদির ফোন পেল কঙ্কা। ফোনেই কথা হল। অপেক্ষা করার কারণ কিছু নেই। একবার ঘুরে এলেই হয়। দিদির শ্বশুরের মৃত্যুর সময়ে যাওয়া হয়েছিল। মৃত্যুটাও কেমন যেন! দেড় বছর আগের কথা। এত মিশুকে আত্মভোলা মানুষ আত্মহত্যা করবেন, বোঝা যায়নি!

—দেখিস, ওর শাশুড়ি কিন্তু অসুস্থ, ধারে কাছে বেশি যাসনে। স্বামী মারা যাওয়ার পরে কেমন হয়ে গেছেন। তাছাড়া, বলতে নেই, ওই মহিলাকে আমার অদ্ভুত মনে হয়! একটু রহস্যজনক। এখন শুনেছি মাথাটা গোলমাল হয় মাঝে মাঝে। হতেই পারে। অমনভাবে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। কার বা মাথার ঠিক থাকে!

"আচ্ছা, আমি কেন দিদির শাশুড়িকে বিরক্ত করতে যাব?" কঙ্কা বিরক্ত হল মায়ের কথায়।

তবে সুবর্ণা খুশি হল বোনকে কাছে পেয়ে, "আয়, ডুমুরের ফুল হয়েছিস। দেখাই পাওয়া যায় না। আমি যে কী ভীষণ লোনলি ফিল করি, জানিস নাতো।"

বাবুইকে নিয়ে হুল্লোড়ে মাতলো কঙ্কা। বহুদিন পরে বাড়িতে হাসি শোনা যাচ্ছিল। পদ্ম উঁকি দিয়ে কঙ্কাকে চিনতে পারল— তাই বলি! বাড়িতে খুশির হাট বসল কোথা থেকে। মাসিকে পেয়ে সোনা আজ খুশি। হবেই তো। বেচারা একেবারে একা থাকে।

হুল্লোড়ের পর হাঁপাচ্ছে কঙ্কা, "উফ, দিদি, বাবুইকে এবারে স্কুলে দে। সঙ্গী পায় তাহলে। তোদের বাড়িতে কেমন একটা দমচাপা ভাব।"

ঠিকই বলেছে কঙ্কা। এক্কেবারে সত্যি কথা। পর্দা টেনে দিয়ে গুছিয়ে বসে সুবর্ণা।

"যা বলেছিস। একেবারে ভূতের বাড়ি। আচ্ছা, কোনও বাড়িতে কি কেউ কখনও মারা যায় না? তাই বলে বাড়িটাই কি পালটে যাবে? জোরে হাসতে বারণ, কথা বলতে হবে ফিসফিস করে, একটু গান আসতে পারবে না গলায়। অমনি নীলম এসে ন্যাকা গলায়— বউদি, বড়মনি গাইতে বারণ করলেন! মানে হয়? বল?"

"কান্ড! এ তো বন্দি দশা রে!"

জবাবে ঠোঁট উলটে দিল সুবর্ণা। আছে কী করে, সেটা কঙ্কাকে বোঝানো যাবে না। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এসব বোঝা যায় না। সংসারের কূটকচালি সামলে চলা কি কম কথা!

"আসলে অ্যাডজাস্টমেন্ট হল বড় কথা, বল দিদি?"

"ওসব বাজে কথা। ওই শব্দটাই একটা ফাঁকিবাজি শব্দ। কিসের অ্যাডজাস্ট? কার সঙ্গে? মা-বাবার সঙ্গে তো আমাদের মানে সন্তানদের অ্যাডজাস্ট করতে অসুবিধে হয় না! তাই বলে মা-বাবা, সন্তানরা... সবাই যে দেবতুল্য সে তো নয়! কিন্তু আপনজনদের মধ্যে অ্যাডজাস্ট শব্দের এত বাড়াবাড়ি কেন? আজকাল বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে এই শব্দটা মালা করে গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়! ছাঁদনাতলাতেই। আর তাই আমরা এই শব্দটার অভাব জীবনে অনুভব করি। শব্দটাই যদি না থাকত, তাহলে গোলমাল এত হত না।"

"বাহ দিদি! তুই এখনও কেমন সুন্দর কথা বলতে পারিস! অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে সব ভুলে যাসনি দেখছি।"

দুই বোনের সম্মিলিত হাসির আওয়াজ পর্দায়

ধাক্কা খেল বলেই কি পর্দা নড়ে উঠল? কঙ্কা হাসি থামিয়ে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে।

"কী হল?" সুবর্ণা কঙ্কার দৃষ্টির অনুসরণে দরজার দিকে তাকিয়েছে।

"কে যেন ওখানে... বোধহয় চোখের ভুল।"

সুবর্ণা চকিতে খাট থেকে নেমে পর্দা সরিয়ে দিল। আলো ছায়ায় ঢাকা বারান্দা কেমন রহস্যময়। কোথাও কেউ নেই। ভারি নির্জন চারপাশ।

"কে রে দিদি?"

"কেউ না। তুই কী দেখেছিস? ছায়া?"

"হ্যাঁ। মানে ঠিক দেখিনি। মনে হল, কেউ আছে ওখানে। চোখের ভুল।"

"নারে। চোখের ভুল নয়। এ বাড়িতে সবই ভারি রহস্যময়। কে যেন ফিসফিস করে কথা বলে। জানালার পাশ দিয়ে সে রাতে কেউ চলে গেল বলে মনে হল। গিয়ে দেখেছি, কেউ ছিল না!"

শিরশির করে উঠল কঙ্কার শরীর, "বলিস না। ভয় করছে। আমি আজ একা শুতে পারব না।"

"দূর, কিসের ভয়? আর একা তোকে শুতে হবে না। বাবুইয়ের সঙ্গে শুবি।" আবহাওয়া হালকা করে ফেলতে জোরে কথা বলছে সুবর্ণা। হাসছে। কিন্তু কঙ্কা হাসছিল না। খুব গুমোট ভাব এ বাড়িতে। ভাল লাগে না। না এলেই হত।

রাতে ভাল ঘুম হল না। নতুন জায়গা বলেই হয়ত। চোখ মেলে শুয়েছিল কঙ্কা। পাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বাবুই। নাইট ল্যাম্পের আলোয় ঘর কেমন ভয়ের আবহে রয়েছে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছে কঙ্কা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন চোখ বুজে এসেছে! একটা অস্পষ্ট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন হাহাকার করে কেঁদে উঠল। এক মুহূর্ত! তারপরই নিঝুম হয়ে গেল বাড়ি।

ত্রাসে বিছানার ওপর বসে থাকে কঙ্কা। এসব কী? কে ওটা? উহ, মাগো!

(৮)

ঘুম ভেঙে গেল দিদির ডাকাডাকিতে। সুবর্ণা দুবার ঘুরে গেছে। এবারে আর না ডাকলেই নয়।

"ভাল ঘুমিয়েছিলি? ভয় পাসনি তো?"

শেষরাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, এখন মাথাটা ভার হয়ে আছে।

"খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। উনি কিন্তু শ্যালিকার সঙ্গে চা খাবেন বলে বসে আছেন।"

"ওহ দিদি, দেবুদা চা খাননি এখনও?"

"চিন্তা নেই। উনি দিনে পাঁচ ছ'বার চা খান। এবারে বের হবেন। তাই তোর সঙ্গ মিস করতে চান না।"

তড়িঘড়ি উঠে বসে কঙ্কা। খুব দেরি হল আজ।

দেবব্রত স্নান সেরে নেয় ভোরেই। আফটার শেভের গন্ধ ভেসে আসছে শরীর থেকে। গল্প করতে করতে আড্ডা চলল। দেবব্রত চা শেষ করে উঠে গেল। চা খেতে খেতে কঙ্কা লোকটিকে দেখতে পেল। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। একহারা চেহারা। সোজা সিঁড়ি টপকে উঠছে। এক বারে তিনটে সিঁড়ি টপকে উঠছে।

কাপটা হাতেই ছিল। সুবর্ণা খোঁচা দিল, "এই কঙ্কা!"

"কে রে দিদি? অবাক হয়ে যাচ্ছি। কে এ?"

"আমার দেওর। নাম শুনিসনি? শুভ। বিয়েতে যায়নি! আগেই বলেছিলাম ওর কথা। মনে নেই?"

"উফ, সেই লোক, যে বাড়িতে ঢুকেই গন্ডগোল করে? তোর সঙ্গে কথা বলেন না?"

"কারও সঙ্গেই কথা বলে না। আমি তো সামনে যাই না। বাজে ছেলে। অপমান করে বসতে পারে। তবে তুই সামনে যাসনে।"

"আমাকে অপমান কেন করবে?"

"সে কী করে বলি! আসলে ওর ব্যবহারটা এমন, যে বুঝতে পারি না ঠিকঠাক। এই ভাল, এই খারাপ। ড্রিঙ্ক করে বাড়িতে এসে ভাঙচুর করবে, গালিগালাজ!"

দু বোনই সিঁড়ির দিকে তাকিয়েছিল। কঙ্কার ইচ্ছে করছিল লোকটিকে আরেকবার দেখার। সুবর্ণা একটা গোলমালের আশঙ্কা করছিল। শুভব্রত এসেছে, অথচ গোলমাল নেই, এটা ঠিক বিশ্বাস হয় না!

"বৌদি, ছোটবাবু এসেছে!" পদ্ম ভয়চকিত চোখে এসে দাঁড়িয়েছে।

"তাতে কী তোমার? তুমি কিচেনে যাও।"

পদ্ম চলে যেতে যেতে কঙ্কার দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিল। বৌদির বোনটিকে ছোটবাবুর কথা

সুবর্ণা চলে গেল। কঙ্কা একা বসে থাকে। এতবড় বাড়ি। কিন্তু বড্ড প্রাণহীন। রহস্যময়ও। মাঝরাতে কে আর্তনাদ করে কাঁদে, মাদকসেবী ছেলে এসে টাকা কেড়ে নেয়, লোকে যখন তখন ভূত দেখে...। আর দিদির শাশুড়ি মা? উনি সাক্ষাৎ ভয়ের দেবী এবং দারুণ রহস্যময়ী! বাপরে! দিদি থাকে কী করে এখানে?

বলা হল না। বৌদি হয়ত সব বলে দিয়েছে। কিন্তু পদ্মর মত কি জানে? পদ্ম বলে কত কিছু!

এক মুহূর্তের জন্য ভেতরে গিয়েছে সুবর্ণা। সে সময়ের মধ্যে নেমে এল শুভব্রত। একই রকম ভঙ্গিতে নেমে আসছে। একবার অকারণেই চোখ তুলতে কঙ্কার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। চোখ সরিয়ে নিল কঙ্কা। কিন্তু বুঝতে পারছিল, শুভব্রত দেখছে ওকে।

কৌতূহল খুব খারাপ জিনিস কি? শুভব্রত চলে গেছে কিনা দেখতে পেছন ফিরে তাকাতেই ফের চোখে চোখ পড়ে গেল। লজ্জা পেল কঙ্কা। শুভব্রত চোখ সরিয়ে বেরিয়ে গেল।

আর তখনই দ্রুত নেমে এল যে, কঙ্কা তাকে আগে দেখেনি। শ্যামলা মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী। স্নিগ্ধ সুন্দর। সেও কঙ্কাকে দেখে থমকে গেল। আর তখনই ফিরে এল সুবর্ণা।

"কী হল নীলম?"

"বৌদি, ছোটবাবু বেরিয়ে গেছেন কিনা দেখছি। বড়মনি বললেন ওঁকে ডেকে দিতে।"

"হ্যাঁ, এই তো বেরিয়ে গেলেন" কঙ্কা দিদির দিকে তাকাল।

"যোগিনকে পাঠিয়ে দাও। দেখ যদি খুঁজে পায়!" সুবর্ণার ভ্রু কুঁচকে আছে।

যোগিন খুঁজতে বেরিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। শুভব্রত যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

"যাক। ও এই রকমই। একটা ভূত।"

কঙ্কার খারাপ লাগল দিদির কমেন্টগুলো, "কেন এভাবে বলছিস?"

"ও বাবা, তুই আবার...! দেখিস, বিশ্বশুদ্ধ লোক যার বিপক্ষে, তুই তার পক্ষে গিয়ে বিপদে পড়িস না।"

"কিসের বিপদ?"

"তা জানি না। বলেছিলাম, আমার দেওরটি সুবিধের না। তুমি আবার তার খপ্পরে পড়ো না।" সুবর্ণা কেমন শুকনো স্বরে কথা বলছিল। কঙ্কা চুপ করে রইল। দিদিটা বড্ড হিংসুটে। কিছুই তো বলেনি কঙ্কা। সবাই বিপক্ষে বলেই কি ওর পক্ষে যাওয়াটা দোষের? ওকে কেউ ফেরাতে পারেনি কেন? কেনই বা খারাপ হয়ে যেতে দিল? ইস, দিদি এসব শুনলে ওকে ঠিক কানুদা বলে ডাকবে। ওদের ওখানকার কানুদা সবসময় সকলের বিপক্ষ পার্টিতে যোগ দিত। সকলে ইষ্টবেঙ্গল, কানুদা বাড়িতে একা মোহনবাগান। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দিনেও কানুদা একা পাকিস্থানের পক্ষে। পাঁচজন মিলে শাহরুখের প্রশংসা করছে, ও গিয়ে ইমরান হাসমির প্রশংসায় মেতে উঠবে।

"কী রে, একা একা কী ভাবিস?"

"আচ্ছা, এ বাড়িতে ভারি সুন্দরী মেয়েটি কে? ওই যে নীলম!"

"হুম, সুন্দরী বলছিস? আমিও সেটাই ভাবি। দুটো মেয়ে যখন কোনও মেয়েকে সুন্দরী বলছে, তখন সেই মেয়ে সুন্দরী অবশ্যই। কারণ ছেলেরা ফাঁকি ধরতে পারে না। মেয়েরা পারে। যাই, স্নান সেরে নিই।"

তখনই কথাটা মনে পড়ল কঙ্কার। ও দিদির হাত চেপে ধরল, "দিদি! এ বাড়িতে মাঝরাতে কে আর্তনাদ করে কাঁদে?"

সুবর্ণা চুপ করে থাকে। প্রথম দিন অভিজ্ঞতা ভাল হয়নি কঙ্কার। কী বা বলবে বোনকে!

"আমার শাশুড়ি। দুঃখ পেয়েছেন খুব। ভুলে যেতে সময় চাই। মাথাটাও একটু...! যাক, ওসব নিয়ে ভাবিস না।" সুবর্ণা চলে গেল। কঙ্কা একা বসে থাকে। এতবড় বাড়ি। কিন্তু বড্ড প্রাণহীন। রহস্যময়ও। মাঝরাতে কে আর্তনাদ করে কাঁদে, মাদকসেবী ছেলে এসে টাকা কেড়ে নেয়, লোকে যখন তখন ভূত দেখে...। আর দিদির শাশুড়ি মা? উনি সাক্ষাৎ ভয়ের দেবী এবং দারুণ রহস্যময়ী! বাপরে! দিদি থাকে কী করে এখানে?

(৯)

দুপুরে দেবব্রত বাড়িতে ফিরল মন খারাপ করে। এসে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে গেল। সুবর্ণা অবাক। সকালেই অন্য মুডে ছিল লোকটা!

"কী হল?"

"শুভ কেস ঠুকেছে আমার বিরুদ্ধে।"

"সে কী! ও আজ এসেছিল!"

"জানতুম না। শুনেছি পরে। মার সঙ্গে এখনই দেখা করতে হবে। মা কি ঘুমুচ্ছে?"

সুবর্ণার পা চলছিল না। অপদার্থটা এসে অশান্তির পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে গেল।

বড়মনি শুয়েছিলেন। নীলম পা টিপে দিচ্ছে। সুবর্ণাকে দেখে উঠে দাঁড়াল নীলম।

"বৌদি এসেছে বড়মনি।"

তন্দ্রা এসেছিল। কথাবার্তায় চোখ মেলে তাকালেন জবালা। সুবর্ণাকে দেখে অবাক হয়েছেন কিনা বোঝা গেল না।

"আপনার ছেলে, কথা বলতে চায়!"

"পাঠিয়ে দাও।" জবালা ফের চোখ বুজলেন।

দেবব্রত ইতস্তত করছিল। সাধারণত এ সময়ে মাকে বিব্রত করতে চায় না। কিন্তু আজ একজন মানুষ দরকার, যার সঙ্গে পরামর্শ করা যায়। সেই মানুষ মা ছাড়া আর কে হতে পারে! বিশেষ করে বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার হলে।

"বল।" জবালা চোখ না খুলেই দেবব্রতর উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন।

"মা, শুভ এমন একটা কাজ করেছে"

"মামলা করেছে?"

"তুমি জানো?"

"হ্যাঁ। ও এসে ভয় দেখিয়ে গেছে আমাকে। কিন্তু সত্যি এমন করতে পারে, বুঝিনি। উকিলের পরামর্শ চাই। ধীরেন চ্যাটার্জিকে ডেকে পাঠা।"

"এত সাহস ও পেল কোথা থেকে?"

"আমি সেটা ভেবেছি। মনে হচ্ছে, ওকে বুদ্ধি দেওয়ার লোক জুটেছে! বিষয় সম্পত্তির দিকে নজর পড়েছে শুভর? বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"শুভকে খারাপ করে দেওয়ার পেছনেও লোক আছে মা। তবে, ভেব না। আমি উকিলবাবুকে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

দেবব্রত চলে যাচ্ছে। দেখতে পেল না ওর দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে আছে নীলম।

জবালা উঠলেন। জল চাইলেন। নীলম জল এনে দিল। ঠান্ডা জলে দু' টুকরো বরফের কুচি। আস্তে আস্তে অনেকটা জল খেয়ে শ্বাস ফেললেন জবালা, "ওহ, মাগো!"

"বড়মনি, শোবেন তো?"

"না। তুই আমাকে ছেড়ে বাইরে যা। একা থাকব। বাইরে থেকে দরজা দিয়ে দে। তুই বাইরে থাকবি। ডাকলে যেন পাই।"

নীলম বেরিয়ে গেল বড়মনির কথামতো।

সুবর্ণা দেবব্রতর দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছু বলছে না দেবব্রত।

"কিছু বল।"

"চিন্তার কিছু নেই।"

"নেই যদি, তাহলে তুমি কেন থম মেরে আছ?" ঝাঁঝালো স্বর সুবর্ণার। এই বাড়িতে সম্পত্তি নিয়ে চিন্তার কমতি নেই। কতই দেখল। কিন্তু শুভ সম্পত্তির ভাগ নিশ্চয় পাবে। ও কি দেবব্রতর বুদ্ধিবলে বৃদ্ধি পাওয়া সম্পত্তির ভাগটাও চায়? মজা মন্দ নয়। বসে বসে খেয়ে এখন এসেছ হকের ধন চাইতে? খাটুনি, বুদ্ধি, সব দেবব্রতর। তাহলে শুভ কেন কেস করে?

"ভাবনাটা সেটা নয়। তুমি ওভাবে না ভেবে অন্য দিক দিয়ে ভাবো। আমার ধারণা শুভকে কেউ বুদ্ধি দিচ্ছে। এখন যে বা যারা শুভকে বুদ্ধি দিয়ে বশ করেছে, তারা কী চায়? এসব করছে কেন? শুভর ভাল চেয়ে করছে? না। মাছ জলের অনেক গভীরে সুবর্ণা। তোমার সাধ্য নেই সেখানে পৌঁছনোর। শুভ সম্পত্তি পেলে, তাদের কী লাভ? শুভ কি তাদের বা তাকে সম্পত্তির ভাগ দেবে? কী মনে হয়? ধরা যাক, শুভ তাদের সম্পত্তিটা দিয়ে দেবে। তাহলে শুভর সম্পত্তির ওপরে লোভ আছে, এমন লোকটি কে? আর ধর, যদি শুভর ভালর দিকে কারও সত্যি নজর আছে, তাহলে আমরা ছাড়া শুভর ভাল চায়, এমন কে আছে? সে আর যে-ই হোক, আমাদের হিতৈষী কিন্তু নয়। তার প্রধান উদ্দেশ্যই হল, আমাদের পরিবারে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা। দু' ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো। সম্পর্কটাকে চুলচেরা ভাগ করে ফেলতে চায় সে। কে আছে বলতো এমন?"

"ওভাবে ভাবতে গেলে, তোমাদের রিলেটিভদের সবার নাম এসে পড়বে। যে শরিকি ঝামেলা চলছে তোমাদের, তাতে এমন মানুষের কি

আমার ধারণা শুভকে কেউ বুদ্ধি দিচ্ছে। এখন যে বা যারা শুভকে বুদ্ধি দিয়ে বশ করেছে, তারা কী চায়? এসব করছে কেন? শুভর ভাল চেয়ে করছে? না। মাছ জলের অনেক গভীরে সুবর্ণা। তোমার সাধ্য নেই সেখানে পৌঁছনোর। শুভ সম্পত্তি পেলে, তাদের কী লাভ? শুভ কি তাদের বা তাকে সম্পত্তির ভাগ দেবে? কী মনে হয়? ধরা যাক, শুভ তাদের সম্পত্তিটা দিয়ে দেবে। তাহলে শুভর সম্পত্তির ওপরে লোভ আছে, এমন লোকটি কে?

কমতি আছে? অনেকেই তোমাদের শত্রু। রেখার বর, শ্বশুর, জীবনকাকুরা তিনভাই, সোনাপিসিমার ছেলে মেয়ে, আর সে, যে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল, ফের সংসারে ফিরে এসেছে, তাকে আমার বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয় তুকতাক শিখে এসে শুভকে বশ করেছে। নাহলে তোমার মত মানুষের ভাই এমন হয় নাকি?"

চকিতে দেবব্রত সুবর্ণার মুখের দিকে তাকাল। সুবর্ণা হাসছিল। বুদ্ধিমতীরাই এভাবে হাসতে জানে। অর্থবোধক হাসি।

"আস্তে কথা বল। এ বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে অজস্র কান।"

দেবব্রত উঠে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। চুরুটের গন্ধ আসছে।

"হ্যাঁ, আমিও মাঝে মাঝে চুরুটের গন্ধ পাই। তবে, চুরুট কিনা জানি না। গাঁজা, চরস হতে পারে। সিগারেটে ভরে নাকি খায় অনেকে?"

সে খেতে পারে। কিন্তু গন্ধটা এখন এখানে কেন? কে খাচ্ছে চুরুট?

দেবব্রতর ভ্রু কুঁচকে ওঠে।

(১০)

আগে তবু একরকম ছিল, এখন অবস্থাটা আরও দুর্বিষহ। জবালা যত্রতত্র ভূতদর্শন করছেন। সুবর্ণা ভয় পায়। কঙ্কাও। দেখাদেখি বাবুইও। কাজের বৌ-ঝিরা পর্যন্ত দিনে রাতে ভূত দেখতে শুরু করেছে। গতকাল কুয়াশা পড়েছিল। কিচ্ছু চোখে দেখা যাচ্ছিল না। সব ঝাপসা। দূরের বাড়িঘর পর্যন্ত অদৃশ্য। জামাকাপড় শুকোল না। আচার দেবে বলে মৌরি ছাদে রোদে শুকোতে দিয়েছিল নীলম। বড়মনি ওর হাতের আচার ভালবাসেন। সেই মৌরি নীচে নামাতে ভুলে গেছে নীলম। যখন মনে পড়ল তখন আর দিনের আলো নেই। সন্ধে হয়ে গেছে। বরমনিকে মাসাজ করে দিতে দিতে মনে পড়ল। বাইরে বেরিয়ে পদ্মকে বলল মৌরিগুলো নিয়ে আসতে। পদ্ম গেল। ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। চোখ মুখ বিবর্ণ।

"দিদি, ছাদে যেন কে! "

মাগো! নীলমের হাত পা পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। বলে কী পদ্ম! এমন কনকনে ঠান্ডায় ভূত ছাদে! চোর হতে পারে।

"তুমি যাও। দেকে এস"

"হতে পারে, জামাকাপড় শুকোচ্ছে হয়ত। দেখে মানুষ বলে মনে হল!"

"আমি জামাকাপড় চিনবো না?"

সত্যি সত্যি যে নীলম এই সন্ধেরাতে ছাদে যাবে, কেউ ভাবেনি! জবালা শুনেও কিছু বললেন না। চোখ তুলে তাকালেন না। নিস্পৃহভাবে বসেই রইলেন।

নীলম ছাদে, পদ্ম সিঁড়ির নীচে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রইল। সুবর্ণাও। কঙ্কা অবশ্য বাবুইকে নিয়ে ঘরে বসে রিং আ রিং আ গাইছে। ওকে কিছু জানায়নি সুবর্ণা। যা ভীতু মেয়ে। নীলম সিঁড়ি বেয়ে নামছে। ওর শাড়ি আলো ছায়ায় অদ্ভুত দুলে দুলে উঠছে। অপার্থিব দেখাচ্ছিল।

"না, না। যতসব পাগলামি। যা, গিয়ে দেখে আয় পদ্ম। কিচ্ছু নেই ছাদে।" নীলমকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

"কিন্তু বৌদি, বিশ্বাস কর, আমি নিজের চোখে দেখেছি!"

রাতে সুবর্ণা দেবব্রতকে বলল সব কথা। রাতে শুতে এসেছে দেবব্রত। শুনে কোনও কমেন্ট করল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মুখ খুলল সুবর্ণা।

"কিছু বলছ না। কী মনে হয় তোমার? পদ্ম ভুল দেখেছে?"

"হতে পারে।"

"এতদিন দেখেনি, আজই দেখল?"

"তুমি কী ভেবেছ বল তো?" দেবব্রত বুঝতে পারছিল সুবর্ণার একটা বলার মত কিছু আছে।

"তোমাদের চেনা কেউ নয়তো? এক বাড়ির ছাদ থেকে অন্য বাড়ির ছাদে লাফিয়ে আসা যায়!"

"কে আসবে? উদ্দেশ্য কী?"

"ধর, যারা আমাদের খারাপ চায়!"

"অর্থাৎ, শুভর ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছ! ঠিক আছে। জেঠুকে বলব। জেঠু ছাড়া সৎ পরামর্শ কে দেবে! অথচ ওকে আমরা বড় শত্রু ভেবেছি।"

"উনি শুভকে ভাল দিকে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাহলে ভাব, যে শুভকে মন্ত্রণা দিচ্ছে, সে

কত বড় তালেবর।"

"আমরা ভাবছি শুভকে কেউ বুদ্ধি দিচ্ছে। কিন্তু এমনও হতে পারে, কেউ বুদ্ধি দিচ্ছে না! শুভ যা করছে, সব, নিজের বুদ্ধিতেই করছে, এমন কি হতে পারে না?"

"তাই কি? শুভর কি এত বুদ্ধি? জানি না বাবা, কার মাথায় কিসের প্যাঁচ ঘুরছে!"

"যা-ই বলিস দিদি, তোদের বাড়িটা ভাই বেশ রহস্যময়। দিনের পর দিন আছিস কী করে? আমি তো ভয়েই মরে যেতাম। শরিকি বিবাদ, এক ভাই রহস্যময় মানুষ, তাদের পিতার রহস্যময় মৃত্যু, অন্য জগতের অধিষ্ঠাত্রী শাশুড়ি...! এ তো রীতি মতো থ্রিলার!"

হেসেছে সুবর্ণা। দুবোনের কথা হচ্ছিল। সুবর্ণার মনে পড়ল —শোন কঙ্কা, তুই গিয়ে আমার শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করে আসিস। এ বাড়িতে এসেছিস, অথচ দেখা করিসনি। ভাল দেখায় না। উনি কী ভাববেন!

কঙ্কা ঘাড় নাড়ল। কিন্তু ভয় ভয় করছিল। আড়াল থেকে দেখেছে দিদির শাশুড়িকে। কেমন যেন...! লাল চোখে ঘোর লেগেছে যেন। কেমন করে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছেন চারপাশে! আর একটা বিশ্রি দেখতে বুড়ি এসেছিল দুপুরের দিকে। হুড়হুড় করে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। কে বুড়িটা? ডাইনি মনে হয়। ইস, কী সব ভাবছে। এখনকার দিনে কি ডাইনি হয়? সে ছিল রূপকথায়।

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল সেদিন। দিদির শাশুড়ি দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক কেমন করে তাকাচ্ছেন। কঙ্কা কাছাকাছি ছিল। কিন্তু আড়ালে ছিল। সেসময় দেখেছিল দিদির শাশুড়ির ঘরের ভেতরের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে ভদ্রমহিলার একটা পোর্ট্রেট দেখা যাচ্ছে দেওয়ালে। কবে তৈরি হয়েছিল পোর্ট্রেটটা?

দিদি জবাব দিয়েছিল, "ওটা আমার শাশুড়ি যখন নতুন বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে আসেন, তখনকার। উনিশ বছর বয়স ছিল।"

কঙ্কা আশ্চর্য হয়েছিল। মহিলা একই রকম আছেন দেখতে! একটু পালটে যাননি। কী করে হল এটা? এখন দেবব্রতর বয়স যদি পঁয়ত্রিশ হয়, তাহলে দিদির শাশুড়ির অবশ্যই ফিফটি ফোর। সেই মানুষের চেহারা উনিশ বছরে আটকে থাকে কী করে?

এখানেই মানুষটিকে ভয় হয় কঙ্কার। কেমন অজানা রহস্যে ঘেরা মানুষটি। এসে দেখা করা উচিত ছিলই। কিন্তু ...! সামনে যেতে ভয় হয়!

(১১)

দেবব্রত নিজেই যোগিনকে পাঠাল। জেঠুকে একবার বাড়িতে আসার কথা বলতে বলে দিয়েছে। ওর নিজেরও একটা খুঁতখুঁতে ব্যাপার আছে। কে জানে কী চলছে বাড়িটার মধ্যে! এত কাল বাবা ভুগেছেন। কারণ বাবা-ই ছিলেন শত্রু নাম্বার ওয়ান। কিন্তু এখন দেবব্রত হয়ে উঠেছে লক্ষ্যবিন্দু। বাড়ির ভেতরে একটা অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। ছোট দানা জমাট হচ্ছে। এটা ভাল লক্ষণ নয়।

মানসরঞ্জন এলেন। সব শুনেও চুপচাপ রইলেন। সুবর্ণা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। জ্যাঠাবাবু ওর বল ভরসা।

"জেঠু, কিছু বলুন।"

"কী বলব? আমি নিজে এর তল খুঁজে পাচ্ছি না।"

"আমিও সেটাই ভাবছি। আমাদের মধ্যে একটা অশান্তি সৃষ্টি করে কার লাভ? আপনার কী মনে হচ্ছে?" দেবব্রতর গলায় আকুতি ছিল। অস্থিরতা ছিল।

"আমি বলছি, পদ্মর কথার ওপরে খুব নির্ভর কর না। এই শ্রেণিরা এমনিতেই ভূত প্রেতে বিশ্বাসী। দিনের আলোয় এরা ভূত দেখে। তবে, তোমরা যদি মনে করো, তাহলে ছাদে একটা পাহারার ব্যবস্থা করতে পার। তাতে খুব লাভ নেই।"

"কিন্তু পাহারা দেবে কে? যোগিন বা ব্রজেনকে পাব না। ওরা এখন আর সন্ধের পরে ঘর থেকে বের হয় না। তাহলে ছাদে পাহারা দিতে রাজি হবে? আমি যদি পাহারা দিই!"

"না, না। তুমি কিছুতেই না। দরকার নেই পাহারার।" সুবর্ণা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল।

মানসরঞ্জন খানিক চিন্তা করে পদ্মকে ডাকলেন। সে তো এলই চোখ দুটো বিস্ফারিত করে। তার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পরে বসতে বললেন মানসরঞ্জন।

"পদ্ম, কী মনে হয়? ভূতটা মেয়ে ছিল? নাকি ছেলে? নারী না পুরুষ?"

একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল সেদিন। দিদির শাশুড়ি দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক কেমন করে তাকাচ্ছেন। কঙ্কা কাছাকাছি ছিল। কিন্তু আড়ালে ছিল। সেসময় দেখেছিল দিদির শাশুড়ির ঘরের ভেতরের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে ভদ্রমহিলার একটা পোর্ট্রেট দেখা যাচ্ছে দেওয়ালে। কবে তৈরি হয়েছিল পোর্ট্রেটটা? মহিলা একই রকম আছেন দেখতে! একটু পালটে যাননি। কী করে হল এটা? এখন দেবব্রতর বয়স যদি পঁয়ত্রিশ হয়, তাহলে দিদির শাশুড়ির অবশ্যই ফিফটি ফোর। সেই মানুষের চেহারা উনিশ বছরে আটকে থাকে কী করে?

"অত বুঝিনি জেঠাবাবু। একটা মানুষ দেখলাম। যেন ছায়া।"

"সে ছেলে না মেয়ে বুঝলে না? পোশাকটা দেখনি?"

"আমি মৌরি তুলছি, আড়চোখে তাকাচ্ছি,"

"কেন?"

"দিনটা কেমন ছিল বলুন? কুয়াশা, জলের ট্যাঙ্কটাকে বিরাট কী একটা মনে হচ্ছিল। ভয় করছিল। তাই চারপাশে তাকাতে তাকাতে মৌরি তুলতে গেছি, হঠাৎ দেখি, জলের ট্যাঙ্কের পাশে কী একটা নড়ে উঠল। একটা ছায়া! উফ, মাগো! আমি ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে!" পদ্ম হাঁপাতে থাকে।

"আচ্ছা যাও। শোন, এ নিয়ে মোট কতবার ভূত দেখেছ বল তো?"

"এখানে এই প্রথমবার দেখলাম। গ্রামে দুবার। একবার পুকুরের পাড়ে!"

"বেশ, তুমি এখন যাও।"

মাঝপথে কথা থামিয়ে ওকে যেতে বলায় পদ্ম খুশি হল না। কিন্তু চলে গেল। ও যেতেই মানসরঞ্জন হাসলেন, "দেখলে? এদের কথায় ভরসা করে দুশ্চিন্তা করছো? তোমার লালনকে মনে আছে? সেই ভ্যানওলা লালন? সে যুবা বয়সে আমার কাছে এসে কত গল্প করতো। একবার জানতে চাইলাম— তুমি প্রতি বছর শীতে বাড়িতে যাও কেন? খেতি জমি দেখতে?"

"না বাবু, আমার এক ভূত দোস্ত আছে। ওর সঙ্গে ঠিক এই শীতকালেই দেখা হয়। দুজনে বসে বিড়ি খাই।"

দেবব্রত হেসে উঠল। কিন্তু সুবর্ণা হাসতে পারল না। ওর দিকে তাকিয়ে ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন মানসরঞ্জন। সস্নেহে হাসলেন, "নীলম কিছু কি দেখেছিল? দেখেনি। তাহলে ভয় কেন? তোমরা কি সুখময়ের কথা ভাবছ? ওর প্রেতাত্মা এসে ছাদে দাঁড়ায়? আপনজনকে নিয়ে এভাবে ভাবতে খারাপ লাগছে না?"

"ওসব নিয়ে কথা থাক। শুভ কেস করেছে। সে নিয়ে বলুন। কী করা যায়?"

"মামলা কেন?"

"সম্পত্তির ভাগ নিয়ে!"

"মামলা কেন করবে? তুমি কি ভাগ দিতে আপত্তি করছো নাকি?" মানসরঞ্জন আশ্চর্য চোখে তাকালেন দেবব্রতর দিকে।

১২

"দেখুন, শুভ আমার কাছে কখনও কিছু বলেনি। আলোচনা করেনি। আসলে, মার সঙ্গেই ওর যা কিছু আলোচনা হয়। মায়ের অবস্থা তো জানেন! মা সেসব কথাবার্তার কিছুই বলেননি। হয়ত, এসব নিয়েই মায়ের সঙ্গে ঝামেলা করতো।"

"তুমি কখনও কি মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করনি?"

"সাহস হয়নি। মা উত্তেজিত হয়ে পড়লে ...!" দেবব্রত হাতাশ ভঙ্গি করে।

চা নিয়ে এল সুবর্ণা। আরাম করে চা খাচ্ছিলেন মানসরঞ্জন। নিজে সারাজীবন অকৃতদার থেকেও এই বয়সে এসে বিরাট দায়িয়ের ভার পেয়েছেন। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে পড়েন। এঁরা তাঁকে মেনে। কিন্তু চিন্তাটা তাঁকেই অনেকটা বহন করতে হয়।

"শোন, আমার মনে হচ্ছে শুভকে ডেকে কথা বল। সরাসরি। ঝামেলা চুকিয়ে নাও। দরকার হলে ওর অংশ দিয়ে দাও। ওকে শুধরে নেওয়া যাবে না। ওকে মুক্ত কর তোমাদের বন্ধন থেকে। গো ইয়োর ওয়ে, মাই হিরো। আই সেট ইউ ফ্রি।"

মানস উঠলেন। দেবব্রত হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে বসেছিল। মানসরঞ্জন বুঝলেন। কষ্ট হবেই। শুভ ক'দিন সব সামলে রাখতে পারবে, কে জানে! সাতে ভূতে খাবে সব কিছু। তখন ফের এসে উঠবে ঠিক এখানে।

"আমি সেটাই ভাবছি। ওকে তো চেনেন! বেশ, দেখি। আপনার পরামর্শ মত দিয়ে দেব। বুঝে নিক। আপনি উঠছেন?"

"হ্যাঁ, তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাই। কেমন আছেন আজ?"

(ক্রমশ)

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য !

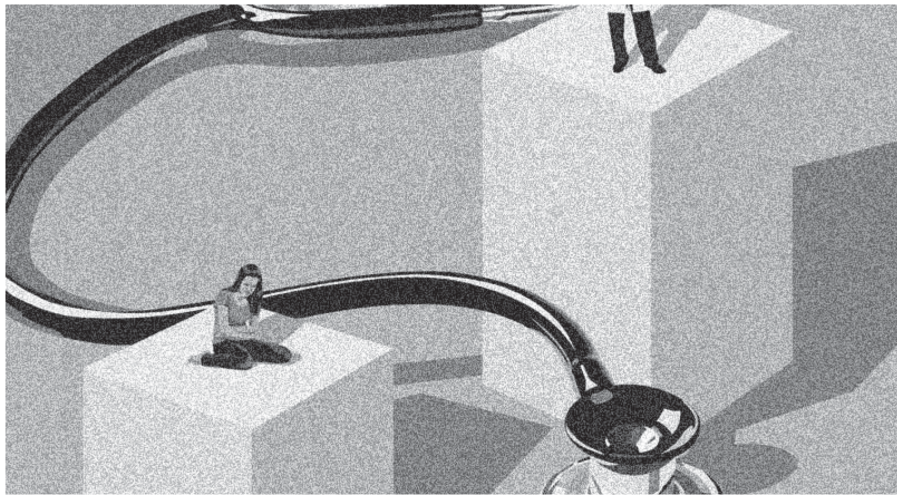

রাখি পুরকায়স্থ

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতীয় পুরুষদের তুলনায় ভারতীয় নারীদের জীবনকাল অনেকটাই কম ছিল। অথচ সাধারণভাবে মনে করা হয়, পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন সকল প্রকার প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে টিকে থাকার জৈবিক শক্তি পুরুষদের চাইতে নারীদের অনেক বেশি। তাই নারীদের এমন অত্যধিক হারে অকাল মৃত্যুর পেছনে নারী-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রিয়াশীল নানান প্রকারের লিঙ্গ বৈষম্যকেই প্রধানত দায়ী করা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য না থাকলে, পুরুষদের চেয়ে মহিলারা গড়ে কমপক্ষে পাঁচ বছর বেশি বাঁচবেন বলে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা।

২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কালে দেখা গেছে, জাতীয় স্তরে ভারতীয় পুরুষকে অতিক্রম করে ভারতীয় নারীরা গড়ে প্রায় তিন বছর বেশি বেঁচেছেন, যা নারীদের মৃত্যু হারের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক পরিবর্তন সূচিত করে। আঞ্চলিক স্তরে অবশ্য এ ব্যাপারে ব্যাপক বৈচিত্র্য নজরে আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেরালায় নারীরা পুরুষদের চেয়ে গড়ে ছয় বছর বেশি বাঁচেন, অথচ বিহারে নারী ও পুরুষদের গড় আয়ুষ্কাল প্রায় এক। তবুও, সম্ভাব্য আয়ুষ্কালের নিরিখে বিচার করে নারী-পুরুষের ব্যবধানে ইতিবাচক পরিবর্তন আসা, এবং সেই সাথে অত্যধিক সংখ্যায় অল্প বয়সি নারীদের মৃত্যুর ঘটনার দ্রুত হ্রাস পাওয়া আমাদের মনে ক্রমশ আশার আলো সঞ্চার করছে। ২০১৫ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে National Family Health Survey থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে টিকাকরণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে কি শেষমেশ নারীদের স্বাস্থ্য আমাদের দেশে অগ্রাধিকার পাচ্ছে?

দুর্ভাগ্যবশত, লিঙ্গের ভিত্তিতে বিচার করলে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ব্যয়ের চিত্রটা তেমন দৃষ্টিনন্দন নয় মোটেই। ২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে, Indian Human Development Survey এবং National Sample Survey Department থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, সকল জনতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী জুড়েই পুরুষদের তুলনায় নারীদের ওপর স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত খরচ পদ্ধতিগতভাবে কম ছিল। যদিও প্রতিবেদনটি বলছে, পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে অনেক বেশি রোগের উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়েছে, তবুও নারীদের বয়স, হাসপাতালে ভর্তি পরবর্তী হাল এবং রোগের ধরন নির্বিশেষে দেখা গেছে, নারীদের স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ পুরুষদের স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়িত অর্থ থেকে সর্বদা কম থেকেছে। ২০১১ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে, সকল বয়সের মহিলাদের কঠিন রোগের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত ব্যয় একই ধরনের রোগে আক্রান্ত পুরুষদের থেকে প্রায় ২,৭৮২ টাকা কম ছিল। ২০১৪ সালে, ১৫ বছর এবং তার বেশি বয়সের জনগণের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মহিলা রোগীদের জন্য গড় ব্যয় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া পুরুষ রোগীদের জন্য গড় ব্যয়ের চেয়ে ৬,৭৭৮ টাকা কম ছিল। ক্যানসার রোগীদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের এই ব্যবধান সব চাইতে বেশি! অধিকন্তু, Distressed Financing ব্যবহারের সম্ভাব্যতা- যেমন, রোগীর স্বাস্থ্যসেবার জন্য ঋণ করা কিংবা সম্পদ বিক্রয় করা —পুরুষ রোগীদের তুলনায় নারী রোগীদের ক্ষেত্রে অনেক কম। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কেবলমাত্র পুরুষদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি থাকলেই ভারতীয় পরিবারগুলি তাদের মূল্যবান সম্পদগুলিতে হাত দেয়।

বিগত তিন দশক ধরে, ভারতের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত গবেষণাগুলিতে উঠে এসেছে, সন্তানদের স্বাস্থের ক্ষেত্রেও লিঙ্গ বৈষম্য সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান:

- পিতামাতারা মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের জন্য অনেক তাড়াতাড়ি এবং প্রায়শই ডাক্তারের পরামর্শ নেন;
- পিতামাতারা মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি টিকাকরণ করান;
- মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশি মাতৃদুগ্ধ পান করান হয়;
- ছেলেরা হাসপাতালে ভর্তি হলে পিতামাতারা ধারদেনা করতে কিংবা কষ্টার্জিত সম্পত্তি বিক্রি করতেও পিছু পা হন না, অথচ মেয়েরা হাসপাতালে ভর্তি হলে তেমনটা করতে কম দেখা যায়।

National Health Profile, ২০১৮ আমাদের দেশের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের, নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে কিছু উদ্বেগজনক তথ্য তুলে ধরেছে। এই তথ্য অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের ৭১.৯ শতাংশ গর্ভবতী মহিলাদের জন্য লোহা এবং ফোলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট মোটেই সহজলভ্য নয়। উপরন্তু, কেবলমাত্র ২১.৮ শতাংশ সন্তানসম্ভবা নারী গর্ভকালীন সেবাশুশ্রূষা পান। অন্যান্য রাজ্যের পরিসংখ্যানও যথেষ্ট বিপজ্জনক। বিহারে ৯৬.৭ শতাংশ মহিলা গর্ভকালীন সেবা-যত্ন সম্পূর্ণরূপে পান না। উত্তর প্রদেশে এই সংখ্যা ৯৪.১ শতাংশ। এই প্রতিবেদনটি বলছে, রাজ্য সরকারগুলির নারী-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মপন্থার ভ্রান্ত রূপায়ণ আর শিথিল নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি এমন অবহেলার প্রাথমিক কারণ। তাছাড়া, ভারতের অধিকাংশ জনকল্যাণকর ব্যবস্থা নানান সমস্যা দ্বারা কোণঠাসা হয়ে আছে। এর প্রতিকার করা একান্ত আবশ্যক।

ভারতীয় নারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি এই উদাসীনতার শিকড় অনেক গভীরে ডালপালা ছড়িয়ে আছে এবং প্রায়শই তা খালি চোখে দৃশ্যমান নয়। সমাজে বহুকাল ধরে চলে আসা অন্যায় প্রথার কারণে, ঐতিহ্যগতভাবে মহিলারা বাকি পরিবারের খাওয়ার পরেই খেতে বসেন। পরিবারের সকলের খাওয়ার শেষে পড়ে থাকা যেসব খাদ্য তাঁরা উদরাস্ত করতে বাধ্য হন, সেই খাবারগুলি মোটেই পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ নয়, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের দেহে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ, বিশেষত লোহার মাত্রা বৃদ্ধি পায় না। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, রাজস্থানে একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পরিবারের সাথে বসে খান এমন সব নারী ও শিশুদের দেহে অপুষ্টির মাত্রা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত লজ্জা কিছুতেই নারীদের

পিছু ছাড়ে না। ঋতুস্রাব (এই সময় মহিলাদের দেহে লোহার ঘাটতি সবচেয়ে বেশি দেখা দেয়) তেমনই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যখন সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে সঙ্কুচিত নারীরা তাঁদের সমস্যাগুলি ব্যক্ত করতে কিংবা সাহায্য চাইতে সাহস পান না। এ ধরনের সামাজিক কুপ্রথার বিস্তার ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে অ্যানিমিয়ার মতো রোগের প্রাবল্যের প্রধান কারণ। অ্যানিমিয়া আবার উচ্চ হারে শিশু ও মাতৃমৃত্যু এবং শিশুদের মধ্যে তীব্র অপুষ্টির কারণ হিসেবে কাজ করে।

নারীদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক মনোভাব কি তাহলে বহুকাল ব্যাপী সমাজের মননের গভীরে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে থাকা পুরুষতান্ত্রিকতার ফল? না কি এর পেছনে রয়েছে আয়কারী এবং বিনাপারিশ্রমিকে সেবাদানকারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য? বিশ্বব্যাংকের মতে, কেবলমাত্র ২৩ শতাংশ ভারতীয় নারী বেতনভোগী কর্মী। বাকিরা গৃহকর্মে নিযুক্ত, সেখানে তাদের অবস্থান বিনাপারিশ্রমিকে সেবাদানকারী বা শুশ্রূষাপ্রদানকারী রূপে। যেহেতু গৃহকর্মে নিযুক্ত নারীদের এই কাজগুলি সরাসরি 'অর্থনৈতিক লাভ' প্রদান করে না, তাই পরিবারে নারীদের স্বাস্থ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব কম!

অবশ্য এই যুক্তিগুলি কোন ভাবেই ভারতীয় নারীর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কম বিনিয়োগের পেছনে থাকা সব কারণগুলিকে ব্যখ্যা করে না। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে নারীরা বহু রকম ভূমিকা পালন করেন। প্রায়শই, তাঁরা সন্তানদের বা স্বামীর স্বাস্থ্যের দিকে বেশি নজর দেন এবং তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজনগুলি উপেক্ষা করেন। আমাদের সমাজ অবশ্য তাঁদের কাছ থেকে এমন ব্যবহারটাই আশা করে। জন্মের পর থেকে পরিবারের মধ্যে মা-ঠাকুমাদের ভূমিকা দেখে-দেখে, তাঁরাও নিজেদের চাওয়া-পাওয়াকে দাবিয়ে রাখাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করেন। তবে ভুলে গেলে চলবে না, নারী জীবনে যদি সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে দেশের জনসংখ্যার একটা বড় অংশের দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য লিঙ্গ বৈষম্য দোষে দুষ্ট ভারতীয় সমাজ দায়ী থাকবে।

স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারতে লিঙ্গ বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে। এমনকি শিক্ষিত ও ধনী পরিবারগুলিও পুরুষের তুলনায় নারীর স্বাস্থ্যের ওপর কম ব্যয় করে থাকে। জনতত্ত্ববিদ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে গবেষণার মাধ্যমে নথিভুক্ত করেছেন, স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে কীভাবে সকল বয়সি ভারতীয় নারীরা বৈষম্যের শিকার হয়ে চলেছেন। নতুন গবেষণা বলছে, এই লিঙ্গ অসাম্যের ফলে বর্তমান সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরষের ব্যবধান আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং সময়ের সাথে তা ক্রমশ বর্ধিত হয়ে চলেছে। নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে তাঁরা পরনির্ভর না হয়ে নিজস্ব স্বাস্থ্যসেবার ব্যয়ভার নিজেরাই যথাযথভাবে বহন করতে পারেন। সেই সাথে বৃহত্তর সমাজের মানসিকতা পরিবর্তনের দিকেও আমাদের সকলের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে, সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে চারিপাশে, যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন, পুরুষের স্বাস্থ্যের মতোই নারীর স্বাস্থ্যও দেশ, সমাজ ও পরিবারের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

আমার সবুজ দ্বীপ

সবুজ মাঠের কচি ঘাসে পা ডুবিয়ে পড়ন্ত বিকেলে পাড়ার বন্ধুদের সাথে দলবেঁধে খেলায় ব্যস্ত যে লাল আমব্রেলা কাটের ফ্রক পরা মেয়েটি, কে ও? এ তো আমারই ছেলেবেলা। জীবনের মধ্যগগনে পৌঁছে ক্লান্ত, অবসন্ন মনে যখনই অতীতের পাতা উলটে দেখতে ইচ্ছে করে, তখনই খুঁজে পাই আমার মেয়েবেলাকে, এভাবেই প্রকৃতির মাঝে।

হিমালয়ের কোল ঘেঁষে পাহাড় ও সমতলের মিলনস্থলে অবস্থিত সুন্দরী ডুয়ার্স। তার লাগোয়া একটি ছোট্ট মফস্বল শহর জলপাইগুড়িতে বেড়ে ওঠা আমার। ডুয়ার্স মানেই সবুজের সমারোহ।

মন খারাপের বিকেলে দূরের পাহাড়ের মৌনতা দেখে উদাস হওয়া, বর্ষার রাতে জানালার কিনারায় আড়ি পেতে বৃষ্টির শব্দ শোনা, বিস্তৃত চা বাগানের মখমলি সবুজের গালিচায় নিজেকে হারিয়ে অজান্তেই দু'কলি গেয়ে ওঠা কিংবা শহরের বুক চিরে বয়ে চলা 'জলপাইগুড়ির টেমস' করলা নদীর সাথে নিভৃত আলাপচারিতায় একটু একটু করে ডালপালা মেলে বড় হয়েছে আমার মেয়েবেলা।

প্রত্যেকেরই বোধহয় একটা সুন্দর ছোটবেলা থাকে। আমারো ছিল। প্রবল বর্ষায় হাঁটুজল ডিঙিয়ে যখন রুটিন মাফিক স্কুলে যেতে হত, তখন ইচ্ছে করত স্কুল কামাই করে কাগজের নৌকো তৈরি করে বাড়ির সামনে উপুর-চুপুর জলে ভাসিয়ে দিই, যার সাথে ভেসে আমিও পৌঁছে যাব আমার ছোট্টবেলার দোর গোড়ায়...!

মাত্র আড়াই বছর বয়সে অ্যালুমিনিয়ামের সুটকেসে বই গুছিয়ে মায়ের হাত ধরে গুটিগুটি পায়ে শিশুনিকেতন স্কুলে যাওয়ার মাধ্যমে সহজপাঠের হাতে খড়ি। শিশুনকেতনে মাইলিদিরা ছোট ছোট লাল, নীল প্লাস্টিকের বাটিতে টিফিন দিত। 'ফিসফাস' (পরে জেনেছি, ওটার নাম নাকি পিশপ্যাশ), সুজি, ডিম, রসগোল্লা, বিস্কুট, জিভে জল আনা হরেকরকম টিফিন। আমার মজা হত যেদিন ডিমসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ টিফিন দিত। আধ-খানা ডিমে আমার একটুকো আশ মিটত না। ডিমের সঙ্গী আপাত-নিরীহ আলুসেদ্ধটাকে আমার মামাতো বোনের (দু'জন সমবয়সী বলে একই ক্লাসে পড়তাম) প্লেটে পাচার করে দিয়ে ডিমসেদ্ধটাকে উদরস্থ করতাম। আমি স্কুল থেকে ফিরতাম ভ্যানকাকুর সঙ্গে। মাঝে মাঝেই আমাদের আবদারে অতিষ্ট হয়ে ভ্যানকাকু বাধ্য হয়ে কিনে দিত কোনদিন কালো হজমি, কোনদিন বা ছোট প্লাস্টিকের প্যাকেটের টক-ঝাল-মিষ্টি তেঁতুলের আচার। আহা! কী তার স্বাদ। একদিন কী দুর্বুদ্ধি হল, আমি আর মামাতো বোন ভ্যানকাকুর সঙ্গে জোরজবরদস্তি করে ফেরার পথে বাড়ি না গিয়ে চলে গেলাম আমাদের সহপাঠিনী রূপার বাড়িতে রান্নাবাটি খেলতে। ঘামে সপসপে স্কুল ড্রেস পরে ওদের বাড়ির বারান্দায় খেলতে বসেছি রান্নাবাটি। লুচিপাতা দিয়ে তরকারি আর রূপার মায়ের রান্নাঘর থেকে লুকিয়ে আনা চাল খেলনার হাঁড়িতে বসিয়ে রান্না করতে করতে কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে টেরই পাইনি। এরই ফাঁকে কাকিমা খেতে দিয়েছে দুধ-মুড়ি। যে দুধ-মুড়ি বাড়িতে 'খাব না' 'খাব না' বলে ঘ্যানর ঘ্যানর করতাম সেটাই খেয়ে অমৃত মনে হল। এবার তো বাড়িতে ফেরার পালা। ভয়ে হাত-পা, প্রায় ঠান্ডা। রূপার পিসির সঙ্গে রিক্সা করে বাড়ি ফিরেছিলাম। ভ্যানকাকু আমাদের বাড়িতে আগেই খবর দিয়েদিয়েছিল বলে সে যাত্রায় আর মার খেতে হয়নি। বকার ওপর দিয়েই গিয়েছিল। এরপর আর না বলে কোথাও যাওয়া? পাগল? কিন্তু একটা কথা এখন খুব মনে হয়, যে, ভ্যানকাকুর ওপর কত বিশ্বাস কত ভরসা ছিল আমাদের, আমাদের বাড়ির লোকেদেরও। আমাদের কত দুষ্টুমি, কত অন্যায় আবদার তাঁকে মানতে হয়েছিল। হজমি চাওয়ার সময় কি কোনওদিন ভেবেছিলাম ভ্যানকাকুর পয়সা আছে কিনা কিংবা অন্য কোনও অসুবিধে হবে কিনা!

রান্নাবাটি ছাড়া পুতুল খেলাটাও জম্পেশ হত আমাদের। আমাদের বাড়ির বাইরের বারান্দায় বসার একটা কাঠের সোফা ছিল। সেটার নীচের অংশটা ড্রয়ারের মত খোলা যেত। ড্রয়ারের ভেতর শোলার বাক্সে ছিল আমার এবং ছোড়দির পুতুলদের সংসার। সেবার হল কি, দিদির একটা নেড়ামুন্ডি পুতুল ছেলের সাথে দিদির বান্ধবীর মেয়ে পুতুলের বিয়ে ঠিক হল। আমরা সব কচিকাঁচারা দিদির সঙ্গে হইহই করে বরযাত্রী গেলাম পাশের পাড়ায়। বিয়ে সম্পন্ন হবার পর পেট ভরে মিষ্টি খাইয়েছিল কনে পক্ষ। ফেরার পথে বর কনের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম ছোট ছোট লেপ, কম্বল, কনের শাড়ি, সাজার জিনিস আরো কত কিছু। তবে পরের দিন বউভাতটা পঞ্চাশ পয়সার চানাচুর আর চার আনার কদমা দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিলাম সেটা বেশ মনে আছে।

বাড়ির পেছন দিকে শোওয়ার জানালার ওধারে একটা শিউলি গাছ ছিল। সন্ধেবেলা শিউলির সুবাস নাকে এলেই মনে হত, দুর্গাপুজো শুরু হওয়ার আর দেরি নেই। প্রতিবছর পুজোর সময় এলেই ঢাকের বাদ্যি, ধূপের গন্ধ, অষ্টমীর অঞ্জলি মনের মধ্যে অন্যরকম মাদকতা তৈরি করত। তিন বোনের মধ্যে আমার আর ছোড়দির বরাবর পুজোর সময় একই রকম ফ্রক হত। পুজোয় বরাবর চারটে জামা হত। অনেকদিন আগে থেকে ঠিক করে রাখতাম কোনদিন কোন জামাটা পরব। একবার অষ্টমীর দিন বিকেলের দিকে কালো মেঘ করে এসেছে। মন বিষণ্ন, সেজেগুজে আর বোধহয় বেরোনোই হল না। সন্ধের পর বৃষ্টি হচ্ছে না দেখে নতুন জামা পরে মাসিদের সাথে হেঁটেই পুজো দেখতে বেরিয়ে গেলাম। যখন 'কদমতলা-দুর্গাপুজা' দেখতে যাচ্ছি তখন এক ফোঁটা দু'ফোঁটা করে নেমে গেল বৃষ্টি, সেই সঙ্গে প্রবল হাওয়া। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেশ জোরে জল পড়তে লাগল আকাশ থেকে। বাড়ির গলির মুখের কাছাকাছি পর্যন্ত আসতে পেরেছি, তারপর আর এগোনো গেল না। পাশের গলির এক বাড়িতে ঢুকে গেলাম দৌড়ে। তখন আকাশে বজ্র-বিদ্যুতের দুন্দুভি তুঙ্গে। ঘন্টা দুয়েক চলল এভাবে। রাস্তায় হাঁটু পর্যন্ত জল জমে গেল। কারুর সঙ্গেই ছাতা ছিল না, অগত্যা বৃষ্টির তাণ্ডবটা বন্ধ হতেই ভিজতে ভিজতে আর নোংরা জল ডিঙিয়ে চলে এলাম বাড়িতে। আমার সবচাইতে প্রিয় আর সখের নতুন জামা ভিজে চুপচুপে। ওই জামাটার জন্য এখনও আমার কষ্ট হয়। পরদিন আবার বেরিয়েছিলাম ঠাকুর দেখতে। সেদিন চকচকে আকাশ।

গলির বাঁক ঘুরে পাশের গলিতে যাওয়ার মুখের যে বাড়িতে কাল আশ্রয় নিয়েছিলাম সেই বাড়ির কিশোর ছেলেটি আমাদের দাঁড়াতে বলে ভেতর থেকে গতকাল আমার ফেলে যাওয়া রুমালটা এনে দিল। মনটা খুব ভাল হয়ে গেল কোনও এক অজানা কারণে। ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কৃতজ্ঞতায়। সেই প্রথম কিশোরী মনের জানালা দিয়ে হৃদয়পুরের বাগানে লুটোপুটি খেতে লাগল একরাশ ভাললাগার রোদ্দুর। যদিও সেই রৌদ্রের তেজের প্রভাব ছিল ক্ষণস্থায়ী তবু এখনও কোনও পুজোর দিন আকাশ ভাঙা বৃষ্টির পর যখন মিঠে রোদ ওঠে তখন ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ আমার বদ্ধ মনে একমুঠো ভাললাগার সুবাস ছড়িয়ে দেয়।

টুকরো টুকরো এইরকম অনেক ছবির কোলাজে মেয়েবেলার ক্যানভাস ভর্তি। তার মধ্যে কোনওটা ফ্যাকাসে, বিবর্ণ, কোনওটা আবার এখনও রঙিন ও মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমি ছোট থেকেই শান্ত ছিলাম। বয়ঃসন্ধি-ক্ষণে হয়ে পড়লাম লাজুক ও ইন্ট্রোভার্ট। আমার মনের রাজ্য জুড়ে তখন কল্পনাদের বাস। কল্পনাকে রূপ দিতাম জলরঙে তুলি বুলিয়ে আঁকার খাতায়। গল্পের বইয়ে মুখ গুঁজে কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে কখনও ভেসে যেতাম রূপকথার রাজ্যে পরী হয়ে। শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' পড়ে নারীদের অবস্থান বুঝতে চাইতাম কখনো বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলা'য় "পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ" লাইনটি বারবার পড়ে শিউরে উঠতাম। ফেলুদা, শার্লক হোমস, কিরীটি বা ব্যোমকেশ গোয়েন্দা হয়ে একের পর এক রহস্যের জট খুলতে ভাল লাগত। পুজোর সময় দশমীতে মেলা দেখার জন্য বড়রা টাকা দিতেন। সেগুলো সব ঘটে জমিয়ে বইমেলার থেকে বই কেনার এক অদ্ভুত নেশা ছিল আমার।

ছোটবেলায় প্রথম গল্পের বই পড়েছিলাম 'সবুজদ্বীপের রাজা'। সবুজ দ্বীপ সম্পর্কে সেই থেকে একটা সাংঘাতিক আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল। গাঢ় সবুজ মোড়া নাম না জানা একটি দ্বীপ, পাড়ে নোঙর বাঁধা একরাশ স্বপ্ন বোঝাই ডিঙি আর একলা আমি। নির্জন অবসরে আমার মানসপটে ঘুরেফিরে আসত সেই জলছবির প্রতিবিম্ব। নাহ্, সে সবুজ-দ্বীপে স্বপ্ন খুঁজতে যাওয়া হয়নি আজও। তবে হ্যাঁ, ডুয়ার্সের সবুজ অবুঝের আদরে জড়িয়ে থাকা প্রকৃতির আপ্যায়নে, দূরের মেঘের আড়ালে রহস্যাবৃত পাহাড়ের হাতছানিতে আর তার নীচে কুলকুল শব্দে বহমান চঞ্চলা নদীর আহ্বানে যখন স্মৃতির টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গোছাতে বসি তখন দেখি নোঙর বাঁধা সেই ডিঙিটা, যেখানে কল্পনাকে সাথী করে আজও প্রতীক্ষারত আমার মেয়েবেলা। চমকে উঠি, তাই তো! আমার শৈশব থেকে কৈশোর পার করে 'সবুজ দ্বীপের মেয়ে' হয়ে ওঠার গল্পের শুরু তো এই সবুজ-দ্বীপ থেকেই...।

চন্দ্রালী চক্রবর্তী

রাসায়নিক রস

একটি বাঙলা বিষয়ক নাটক

(মঞ্চ আলো-আঁধারি। ডি এল রায়ের প্রবেশ)

রায়: না-আ-আ-আ! আর পাচ্ছি না। কী করে সহ্য কর্বো বাঙলার হাহাকার! অই দেখ! তমোনাশি বিদ্যুচ্চমকের আলোকে কেমন ঝলসে ঝলসে উঠছে হিন্দীশ্বরের উন্মত্ত তলোয়ার! আমার বাঙলা ভাষা কুচি কুচি হয়ে যাচ্ছে তার আঘাতে। হায় আমি অভাগা ভাষাপ্রেমী! অসহায়ের মত দেকচি বাঙালী বালক-বালিকার দল ইংরেজির স্রোতে ভাস্তে ভাস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে মহাকালরূপী হিন্দির জঠরে। মর্বে মর্বে! বাঙালী স্বখাত সলিলে মর্বে।

মাইকেল: কী হল? এত বিলাপের কী আছে?

রায়: বাঙলা ভাষা শেষ হয়ে যাচ্ছে মধু?

মাইকেল: কই? তেমন কিছু তো মনে হচ্ছে না রায়! কোচবিহার থেকে মেদিনীপুর —বাঙালী তো দিব্যি বাঙলা বলছে।

রায়: ভুল মধুদা! ভুল! বাঙালী রবি ঠাকুর পোর্ছে না। নজরুল পোর্ছে না!

মাইকেল: এ দু-জনকে তো আমিও পড়ি নি রায়! তা আমি কি নন-বেঙ্গলি?

রায়: বাঙালী বানান জানে না। ফেসবুকে বাঙলা পোস্ট দেখলে আমার ভয় করে! এত ভুল, এত ভুল!!

মাইকেল: মলো যা! ফেসবুক কি বাঙলা সেকেন্ড পেপারের খাতা?

রায়: হায়! বিধাতার এ কী পরিহাস! নয় তো মধুদার চোখে কেন ধরা পোর্ছে না বাঙালীর অধঃপতন? কেন তাঁর কর্ণকুহরে উত্তপ্ত লাভার ন্যায় কেন প্রবেশ করছে না বাঙালীর আপন ভাষার আধুনিক উচ্চারণ? সে উচ্চারণে কেবলই হিন্দি, কেবলই ইংরিজি! আর সহ্য কোর্তে পার্ছি না!

মাইকেল: ধেত! বাঙালী উত্তেজিত হলে নিজের ভাষা বলে না। বাঙালী প্রেম করে বাঙলায়, বউ পেটায় হিন্দিতে।

(ঝড়ের গতিতে এক মাস্তানের প্রবেশ)

মাস্তান: কী হোচ্চে কী? ভাসা নিয়ে কী সব আলফাল বোলচেন আপনি? সুনে রাকুন সার! বাংলা ভাসা এখন ডাইং! ভাসাকে আমাদের বাঁচাতে হবে। ঘরে ঘরে রোবিন্দনাথ, নোজ্জুল তৈরি করতে হবে। বুথ লেবেল থেকে নামতে হবে। সুদ্ধ বাঙলায় লিকতে হবে। বানান ভুল হলে ধোলাই খাবে। বেশি ভুল হলে গণধোলাই।

মাইকেল: দেখ রায়! দিব্যি বাঙলা বলছে এই মাস্তান।

রায়: এ বাঙলা নয় মধুদা! এ বাঙলার প্রেত!

মাইকেল: (স্বগতোক্তি) মাস্তান কী ভাবে শান্তিনিকেতনের বাঙলা বলবে? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা রায়, মাস্তান যদি তোমার নাটকের চরিত্র হত তবে কি বঙ্কিমের বাঙলা বলত?

রায়: (অসন্তুষ্ট) আমাকে কি আপনি তেমন নাট্যকার ভাবেন?

মাস্তান: আপনাদের কথায় বানান ভুল হচ্ছে না তো?

রায়: এই ছোকরা! আমরা কি বানান করে কথা কইচি?

মাস্তান: আপনাদের কথায় মনে হচ্ছে হিন্দি শব্দ ঢুকে যাচ্ছে! যা বললেন আবার বলুন তো!

রায়: থাবড়ে দাঁতের পাটি খুলে হাতে দিয়ে দোব হতভাগা!

মাস্তান: ঠিক ধরেছি! আপনারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছেন, তাই না?

(অধ্যাপকের প্রবেশ)

অধ্যাপক: কী ব্যাপার মাস্তান? তুমি থাকতে বাঙলার বুকে দাঁড়িয়ে দূষিত বাঙলা বলার সাহস এরা কী করে পায়? এ হেন বাক্য শোনার চেয়ে আমি রানি বানানে মুর্ধন্য ন দিয়ে মরে যাব।

রায়: (উচ্ছ্বসিত) শোনো! শোনো! কী অপূর্ব! আহা! এঁরা আছেন বলেই বাঙলা ভাষা আজো টিকে আছে মধুদা!

মাইকেল: বাঙলা কি তবে অধ্যাপকদের ভাষা হয়ে গেল, রায়?

অধ্যাপক: বাঙলা অধ্যাপকের, বাঙলা একাদেমির— রবি ঠাকুরের বাঙলা, নজরুলের বাঙলা, বিবেকানন্দের বাঙলাকে আমরা বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করব। সমস্ত সাইনবোর্ড আমরা বাঙলায় চাই। হিন্দির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই–।

মাইকেল: কী বিপদ! ক-টা বাঙালি বউ-ছেলের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলে?

মাস্তান: তার মানে তুই চাইছিস হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হোক, তাই তো? (ঘুসি) আরে! ঘুসিটা কোথায় গেল?

মাইকেল: ঘুঁসিটা লাগল না কেন কি আমি সুক্ষ্ম শরীরে আছি।

অধ্যাপক: মার! মার! কেন কী বলেছে!

মাস্তান: (হাওয়ায় একাধিক কিল-চড়-ঘুঁসি চালিয়ে) আরে ভাই ঘুঁসি কিঁউ নেহি লাগতা?

অধ্যাপক: ঠিক সে মারো! শালে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদকা দালাল হায়!

মাইকেল: দেখ রায়! বাঙালি উত্তেজিত হলে হিন্দি বলে!

রায়: হায়! যে দন্ডিতে করে ভর পারাবার অতিক্রম কোর্তে চেয়েছিলাম সে দন্ডি শীর্ণ শুষ্ক ডালের মত ভেঙে গেল!

মাইকেল: ফালতু চাপ নিচ্ছ রায়! আমি বাঙালিকে বাঙলা বলতে শুনেছি। রাজ্যের সর্বত্রই ওরা বাঙলা বলছে।

রায়: বলছেন?

মাস্তান: শালা ভুল বানানে কথা বলে পালাবি কোথায়? এক্ষুনি এক ট্রাক লোক নিয়ে ফিরে আসছি!

অধ্যাপক: আমিও বাড়ি যাচ্ছি। ফেসবুকে কড়া একটা পোস্ট দিয়ে বুঝিয়ে দেব বাঙালি হয়ে বাঙলা ভাষাকে অবজ্ঞা করা আজ কোন জায়গায় গেছে!

রায়: ফেসবুকটা কী?

(দুম করে লোডশেডিং হওয়ায় মঞ্চ অন্ধকার)

অনু ঘটক

ডুয়ার্সের বই। রংরুট-এর বই

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন
১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যায় (বই না পেলে অর্ডার করুন)

কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট। **রিড বেঙ্গলি বুক স্টোর** ৪২ এ সর্দার শংকর রোড, কলকাতা ২৯। ফোন ৮১০০৯০৫৫৬৬

শিলিগুড়ি: বিশ্বাস বুক এজেন্সি, হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: ভবতোষ ভৌমিক** কমার্স কলেজের বিপরীতে **আলিপুরদুয়ার: ম্যাগাজিন সেন্টার** কলেজ হল্ট। **কোচবিহার: দাস নিউজ এজেন্সি** বড় পোস্টাপিসের বিপরীতে। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** ধানসিঁড়ি।

*** প্রায় নিঃশেষিত

অনলাইনে কিনুন আমাদের বইপত্র **www. readbengalibooks.com**

পাঠকের পর্যটন

দলগাঁও থেকে পাখির চোখে বর্ষার মায়াবী ডুয়ার্স

প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

মাঝে মাঝেই ভাবি, ভাগ্যিস ঘরের পাশে হাত বাড়ালেই ছিল অপূর্ব ডুয়ার্স। একঘেয়ে পরিশ্রান্ত জীবনে কোনওমতে একটা বা দুটো রাতের ফাঁক বের করে ফেলতে পারলেই হল। মিলতে পারে একফালি অপার মুক্তি। এবারের বর্ষায় আগে থেকেই সব ঠিক করা ছিল। সাধারণ পর্যটকের পরিচিতির বাইরে যে অনাবিল ডুয়ার্স তারই খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলাম সপরিবারে। ফালাকাটা বীরপাড়া-দলগাঁও নাগরাকাটা পেরিয়ে খুনিয়া মোড় থেকে ডাইনে চাপরামারি-ঝালং-বিন্দুর অতিচেনা পথ। গৈরিবাস থেকে পথ উঠে গিয়েছে উপরের দিকে। ঝালং থেকে সড়ক দূরত্ব চার কিলোমিটার। গৈরিবাস থেকে দু ঘন্টার চড়াই ট্রেক করা যায়, শাল আর পাইনের ঘন বনের রোমাঞ্চ নিতে। ভাবছিলাম এই দু-আড়াই হাজার ফিট উচ্চতায় পাইন এল কোত্থেকে?

ভাবনায় সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়া ভাল। যখন ভরা বর্ষায় উত্তাল হয়ে উঠেছে হিমালয়ের পাদদেশ, তখন পাখির চোখে গাঢ় সবুজ সেই মোহিনী রূপ দেখতে পৌঁছে গিয়েছিলাম দলগাঁও ভিউ পয়েন্টে। ডুয়ার্সের সর্বোচ্চ স্থান কি এটিকেই বলা যায়? জানি না, তবে দলগাঁও থেকে ডুয়ার্সের যে ল্যাণ্ডস্কেপ পাওয়া যায় তার তুলনা গোটা ডুয়ার্সে আর মেলে না সে কথা হলফ করে বলতে পারি। রাশি রাশি ঘন মেঘ চাদরের মত জড়িয়ে রেখেছে ভুটানের পাহাড়গুলিকে, আর ফ্রেমের মধ্যিখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে ভুটানের দেচু ওরফে আমাদের জলঢাকা। বর্ষায় প্রবল গতিময় সে জলধারা এত উঁচু থেকে দেখলে মনে হয় যেন স্থির হয়ে আছে। কোলাহলের পৃথিবী থেকে অনেকটা উপরে উঠে এসে মিলতে পারে এক অনাবিল শান্তি। পাহাড়ি গ্রাম দলগাঁও সেই স্বর্গীয় শান্তির ঠিকানা।

পর্যটনের উন্নয়নে জিটিএ অনেক কিছু করবার চেষ্টা করেছে চোখে পড়ল। ভিউ পয়েন্টের সৌন্দর্য বাড়ানো ছাড়াও তৈরি হয়েছে আটটি আধুনিক ব্যবস্থাসহ কটেজ, কিন্তু জলের সাপ্লাই নেই, তাই সেইসব সুসজ্জিত কটেজ চালুই হয় নি। এর পরেরবার হয়ত এসে দেখব ঝোপঝাড়ে ঢেকে গিয়েছে কটেজগুলি। অতএব রাত্রিবাসের জন্য ভরসা সেই হোম স্টে (সংগ্রাম সোতাং ৮১৪৫৫৬১৬৬৫), যেখানে আতিথেয়তা বা আন্তরিকতার কোনও তুলনা নেই।

দলগাঁওতে একরাত কাটিয়ে আমরা গিয়েছিলাম রঙ্গো। আগামী সংখ্যায় বলব সে কাহিনী।

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.